সাজ + বদল

॥ মনোজ বসু ॥

আগস্ট, ১৯৪২

॥ এক ॥

গ্রাম দুধসর, পোস্টাপিস সুজনপুর, থানা জাঙুলগাছি।

গাঁ-গ্রাম তো কতই, আমাদের দুধসরের মতো আর একখানা গ্রাম কোথায় আছে দেখান। নেই কি এখানে? ইঞ্জিনিয়ার আছেন, সাবজজ আছেন, রায়সাহেব আছেন। ডাকসাইটে উকিলও ছিলেন একজন—সিংহ-গর্জনে কলকাতা শহরের মহামান্য হাইকোর্ট প্রকম্পিত করে বেড়াতেন। রিটায়ার করে এখন ঘোরতর সাধু।

এর উপরে আরও এক তাজ্জব বস্তু এসে পড়ল—

দু-দুটো পাশ-করা শিক্ষিত মেয়ে কাঞ্চনমালা। শৈলধর ঘোষের ছোট মেয়ে কাঞ্চন। মা নেই। মা মারা গেলেন, কাঞ্চন তখন দশ বছরেরটি। আর শৈলধরের একমাত্র ছেলে বেণুর বয়স চোদ্দ।

মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে কলকাতা থেকে মামা এসে পড়লেন। জগন্নাথ চৌধুরি, মস্ত মানুষ তিনি। শৈলধরকে বললেন, দিদি চলে গেলেন, আপনার তো এই অবস্থা ঘোষজা মশাই। বেণুধর একমাত্র ছেলে আপনার, তার সম্বন্ধে বলতে যাচ্ছি নে। কাঞ্চনকে দিয়ে দিন আমায়। তিনটে মেয়ের বিয়ে আপনি দিয়েছেন, কাঞ্চনের দায়ভার আমার উপরে। উপযুক্ত রকমে মানুষ করে কলকাতা থেকেই বিয়েথাওয়া দিয়ে দেব। আপনাকে ঝামেলা পোয়াতে হবে না।

জগন্নাথের ছেলেপুলে নেই। টমাস ব্রাইটন কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার তিনি, অঢেল রোজগার। পাহাড়প্রমাণ টাকা জমেছে—শৈলধর ও বহুজনের অনুমান। খরচ করে হালকা হবেন, সেজন্য ছটফট করছেন অনেক বছর ধরে। কাঞ্চনের মা থাকতেও একবার কথাটা উঠেছিল।

কী একটা যোগ উপলক্ষে শৈলধর স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে নিয়ে জগন্নাথের বাড়ি উঠেছিলেন। গঙ্গাস্নান করবেন, এবং শহর

এমনি চলল। বছরে মাস বারোটার বেশি নয়—চারবার এই নিয়মে কুটুম্ববাড়ি গেলেই হল।

দিব্যি দিন কেটে যাচ্ছে শৈলধরের। কলকাতায় মামাবাড়ি ছেলেমেয়ে তুটো সুখেই আছে, লেখাপড়া করছে। আশ্চর্য মেধাবিনী কাঞ্চন, টপাটপ তুটো পাশ করে ফেলল। বেণুধর এমনি বেশ ভাল হলেও লেখাপড়ার ব্যাপারে কেমন যেন। বার তুই-তিন ফেল হয়ে গড়াতে গড়াতে ম্যাট্রিকটা পাশ করল। চেষ্টাচরিত্র করে জগন্নাথ তাকে একটা মেশিন-টুল ফ্যাক্টরিতে ঢুকিয়ে দিলেন—কাজ-কর্ম শিখবে, পকেট-খরচাও পাবে কিছু কিছু। শিখে নিতে পারলে বি. এ., এম. এ. পাশের চেয়ে অনেক বেশি রোজগার। চাই কি আলাদা কারখানা করে এম. এ. পাশ কেরানি মাইনে করে রাখতে পারবে—সমর গুপ্তর মতোই এম. এ. পাশ-করা ছেলে।

আর কাঞ্চন? রূপ যেন ফেটে পড়ছে। নাম কাঞ্চন তো সত্যি সত্যি বুঝি কাঞ্চন দিয়ে গড়া। চোখে হারান তাঁরা মেয়েটাকে —জগন্নাথ-জ্যোৎস্না তুজনেই।

জগন্নাথ বলেন, পড়াব ওকে, যতদূর খুশি পড়বে। কলেজ খুলে গেলে বি.এ. ক্লাসে ভর্তি হয়ে পড়্ কাঞ্চন।

জ্যোৎস্না বলেন, বিয়ে দিয়ে দেব। মেয়ে থুবড়ো করে রাখতে নেই। জামাই আসা-যাওয়া করবে, জামাই নিয়ে আমোদ-মচ্ছব করব, বড্ড ইচ্ছে আমার।

স্বামী-স্ত্রীতে কিছু তর্কাতর্কির পর সন্ধি হয়ে গেল : তুই রকমই হতে পারে—বাধা কি? বিয়ে হবে, পড়াও চালিয়ে যাবে কাঞ্চন।

ঘটক-ঘটকী আসছে রকমারি সম্বন্ধ নিয়ে। এর মধ্যে একটি ছেলের আনাগোনা খুব। সমর। কোন ঘটকের সংগ্রহ নয়, এমনিই এসে পড়েছে। শিক্ষিত হয়েও ছেলেটির ব্যাপার-বাণিজ্যে মতি। চায়ের বাক্স সাপ্লাইয়ের ব্যাপারে অফিসে আসে। আসত গোড়ার দিকে ক্যাশিয়ার শ্যামকান্তর কাছে। ক্রমশ ম্যানেজার

জগন্নাথ অবধি পৌঁছে গেল। জগন্নাথই একদিন সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে এলেন। বাড়ির ছেলের মতোই সে এখন।

নজরে ধরবার মতো ছেলে। দোহারা ফর্সা চেহারা, মধুর কথাবার্তা। ইকনমিকসে এম. এ., স্মার্ট চালচলন—

জ্যোৎস্না কতবার বলেছেন, দিব্যি ছেলেটি, এইখানে তবে পাকা-পাকি করা যাক। যে বেশি বাছতে যায়, তার শাকেই পোকা।

ছেলে ভাল—জামাই করবার মতন ছেলে, সন্দেহ কি। জগন্নাথ খুবই টানেন সমরকে। প্রায় একচেটিয়া কণ্ট্রাক্ট পাচ্ছে সে এখন, তাই নিয়ে অফিসে কথাও উঠেছে। কিন্তু বিয়ের প্রসঙ্গে উৎসাহ দেখান না জগন্নাথ। ভালর উপরেও ভাল থাকে। পাকাকথা দিলে আর ফেরানো যাবে না। কাঞ্চনের বর কত উৎকৃষ্ট হবে, ভেবে তিনি দিশা করতে পারেন না।

জ্যোৎস্না হেসে বলেন, তুমি পাকা না করলে কি হবে। কোন্ দিন দেখবে, জোড়ে এসে পায়ের গোড়ায় প্রণাম করছে। কাঞ্চনই পরিচয় করিয়ে দেবে: মামা, তোমাদের জামাই—

জগন্নাথ উড়িয়ে দেন: কিছু না, কিছু না। কাঞ্চন সে মেয়ে নয়। বয়সটা খারাপ বলে চোখের নেশা। আজকালকার মেয়ে ওরা—আরও ভাল পাত্তর জুটিয়ে আনো, লহমার মধ্যে সেইদিকে মন ঘুরিয়ে নেবে।

অতএব ঘটকের কাজ আরও জোরদার চলল। ভাল ভাল সম্বন্ধ আনছে, জগন্নাথের মন ভরে না: আরও দেখুন ঘটকমশায়রা। মেয়ে দেখেছেন, পাত্রও তেমনি নিখুঁত চাই। সকল দিক দিয়ে—শিক্ষায় চেহারায় আচরণে। টাকাকড়ি আছে না আছে বড় কথা নয়, মেয়ে আমাদের খালি হাতে যাবে না।

জ্যোৎস্না জোর দিয়ে বলেন, টাকাকড়ি বেশি থাকলে তেমন সম্বন্ধ বাতিল। বড়লোকের বড্ড দেমাক। টাকা না থাকলে জামাই মেয়ের অনুগত থাকবে—উঠতে বললে উঠবে, বসতে বললে বসবে। কুটুম্বিতে বেশি জমবে আমাদের সঙ্গে

এমনি মনোভাব স্বামী-স্ত্রী দুজনের, উদ্যোগ-আয়োজন চলছে সেইভাবে। হঠাৎ সমস্ত বানচাল হয়ে গেল বিনা-মেঘে বজ্রাঘাতের মতো। কোম্পানির কী সমস্ত কালোবাজারি বেরিয়ে পড়ল। অফিসের কাগজপত্র শিল করে পুলিস মোতায়েন হল। ডিরেক্টর গ্রেপ্তার হলেন এবং জেনারেল ম্যানেজার হিসাবে জগন্নাথও।

ডিরেক্টর তারপরে কোন্ কৌশলে ছাড় পেয়ে গেলেন, ঈশ্বর জানেন (এবং এনফোর্সমেণ্ট বিভাগও নিশ্চয়)। যাবতীয় দায় বর্তাল একলা জগন্নাথের উপর। বরখাস্ত হলেন এই প্রবীণ বয়সে; তাঁর চেয়ারে নতুন ম্যানেজার বসে কোম্পানি চালাচ্ছে। বাইরের কোন নতুন মানুষ নয়—রামকান্ত ক্যাশিয়ার ছিলেন, তাঁরই পদোন্নতি।

জগন্নাথ জামিনে খালাস আছেন। চিরকালের সম্মান-প্রতিপত্তি কয়েকটা দিনে রসাতলে তলিয়ে গেল। তদ্বিরের জন্য টাকায় আবচেক। আইনসঙ্গত তদ্বির এবং গোপন তদ্বির—যার নাম ঘুষ। সে টাকার লেখাজোখা নেই। আপৎকালে দেখা গেল, জগন্নাথের রোজগার যেমন অঢেল ছিল খরচও তেমনি। জাঁকজমকে থাকা মানুষ, টাকা পোকার মতো গায়ে কামড়ায়, খরচা করে ফেলে নিরুপদ্রব হতেন। সঞ্চয় কিছুই নেই শুধু বাড়িখানা ছাড়া। বাড়ি এবং যাবতীয় আসবাবপত্র বিক্রি করে দিলেন। সমস্ত ঘুচিয়ে নগদ টাকা নিয়ে স্ত্রীর হাত ধরে কোন এক বস্তির চালায় আত্মগোপন করবেন, মরে গেলেও ঠিকানা জানতে দেবেন না কাউকে। চেনা লোকের কাছে মুখ দেখাতে লজ্জা। শুধুমাত্র কাছারি-আদালত ও সরকারি কোন কোন বিভাগে অবরে-সবরে আত্মপ্রকাশ করবেন।

বেণুধর ইতিমধ্যেই মেসে গিয়ে উঠেছে। বলে, এদিকে এই কাণ্ড হয়ে গেল—তার উপর বাবা বাড়ি থেকে কেবলই চিঠি লিখছেন, সংসার অচল। মাসে মাসে তাঁকে টাকা পাঠাতে হবে। সামান্য হাত-খরচায় চালাব কি করে মামা, ফ্যাক্টরির শিক্ষানবিশি ছেড়ে ওদের অফিসের কেরানী হয়ে গেলাম।

আর কাঞ্চন ?

চলে যাক সে ভুধসরে বাপের কাছে। তাছাড়া অন্য কোন উপায় ? চোখের জল মুছে জগন্নাথ বললেন, আমার সাজানো সংসার লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। হিংসুটে লোকে ষড়যন্ত্র পাকিয়ে সর্বনাশ ঘটিয়েছে। আমি ছাড়ব না! জীবন পণ করে লেগে পড়ে রইলাম। সামলে উঠব ঠিকই, দিন ফিরবে। সবাই তখন আবার একসঙ্গে জমব। পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস হয়েছিল, আমাদেরও তাই। তোর, বেণুর, আমার, তোর মামীর— এবাড়ির সকলের।

ভুধসরের পৈতৃক ভিটায় শৈলধর ইদানীং স্থায়ী হয়ে আছেন। বয়স হয়ে শরীর একেবারে ভেঙেছে—পালা বেঁধে মেয়েদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে পেরে ওঠেন না। তাছাড়া মেয়ে-জামাইয়ের উপর শ্বশুর-ভাসুররা সব আছেন—দিনকাল খারাপ, জিনিসপত্র অগ্নিমূল্য, নিয়মিত কুটুম্বটির সম্বন্ধে আজকাল তাঁরা বড্ড খিটমিট করেন। নাকি বলাবলি হচ্ছে, ঘর-জামাই জানা আছে—জামাই শ্বশুরবাড়ির পোষ্য হয়ে থাকে। এমনধারা ঘর-শ্বশুর কোনকালে কেউ দেখেনি বাবা—জামাইদের শ্বশুরকে পুষতে হয়।

বাপের সম্বন্ধে মেয়েরা এই সমস্ত কুচ্ছোকথা শোনে। বড়মেয়ে এক দিন তো মুখের উপর স্পষ্টাস্পষ্টি বলল, বাবা তুমি এসো না আর এদের বাড়ি।

শৈলধর খিঁচিয়ে উঠলেন : আসতে হয় প্রাণের টানে। মেয়ে তোরও আছে—বিয়েথাওয়া হয়ে পরঘরি হোক, কেন আসি সেই দিন বুঝতে পারবি।

মেয়ে জেদ ধরে বলে, তা হোক, আসবে না তুমি আর কখনো। এ বাড়িতে যদি দেখতে পাই—বিষ খাব, নয়তো গলায় দড়ি দিয়ে মরব।

অন্য দুই মেয়ের কথাও প্রায় এমনি। হেন অবস্থায় কী করে

তাদের বাড়ি যাতায়াত চলে। অগত্যা ভূধরের বাড়িতেই চেপে বসতে হল।

হাত পুড়িয়ে কোন রকমে দুবেলা দুমুঠো চাল নিজের জন্য সিদ্ধ করে নিচ্ছিলেন, এর উপর কাঞ্চন এসে পড়ল। যেমন তেমন নয়, শহরের পথে জুতো খুটখুট করে-বেড়ানো বাবুমেয়ে। বিপন্ন হয়ে গাঁয়ে আশ্রয় নিয়েছে, কিন্তু সাজপোশাক ঠাটঠমক কিছুই ছেড়ে আসেনি। কত রকমের বায়নাক্কা নিয়ে এসেছে কে জানে। বেণুধর দশ টাকা করে পাঠায়, সম্বলমাত্র নেই। আর কিছু ক্ষেতের ধান। চোখে অন্ধকার দেখছেন শৈলধর।

কাঞ্চনেরও তাই। অন্ধকার চতুর্দিকে। শৈশবটা ভূধরে কেটেছিল, তারপর থেকে গাঁয়ের কিছু জানে না যে। গাঁয়ের নামে শিউরে ওঠে মামা-মামী। আসতে দেননি কখনো। মা নেই, বাপের ঐরকম বাউণ্ডুলে দশা—এসে উঠবেই বা কোথা? শৈলধর একবার দুবার গিয়েছেন কলকাতায়, কিন্তু বড়লোকের বাড়ির বাঁধা নিয়মকানুনে পালাই-পালাই ডাক ছেড়েছেন। জগন্নাথও তাই চান—ঐ রকম চেহারা ও আচরণের মানুষ ভগ্নিপতি পরিচয়ে ঘোরাফেরা করবেন, এতে তাঁর ইজ্জতহানি হয়।

সেই মেয়ে গাঁয়ে চলল। যাচ্ছে চলে চুপিসারে। তবু যার কানে যায় সে-ই হা-হুতাশ করে। সকলের বড় বান্ধবী মঞ্জুলা—

বিদায় দিতে এসে সে বলে, হৈ-চৈ ছাড়া থাকতে পারিসনে। অজঙ্গি জায়গায় কথার দোসরই তো মিলবে না তোর।

কাঞ্চন জল-ছল চোখে বলল, দুনিয়ার মধ্যে কোনখানে আমার ঠাঁই নেই ঐ গ্রামটুকু ছাড়া।

তাড়াতাড়ি কথা ঘুরিয়ে মঞ্জুলা প্রবোধ দিয়ে বলে, একদিক দিয়ে ভালই—নতুন এক ধরনের জীবন দেখে আসবি। এসে যাবি আবার দু-পাঁচ মাসের ভিতর, ভাবনা কিছু নেই।

কাঞ্চন বলে, চাকরি ? কত কত বিদ্বান গড়াগড়ি যাচ্ছে, আমার মতো আধামুখ্যুকে ডেকে কে চাকরি দিচ্ছে ?

আবার কত কত আকাট-মুখ্যুও মোটা চাকরি করছে, খুঁজে নিয়ে দেখ। মিনিস্টার অবধি হচ্ছে। দেশ স্বাধীন হয়ে কত রকম সুবিধে !

সুর বদলে মিটিমিটি হেসে মঞ্জুলা আবার বলে, চাকরি না-ই বা হল—কোন্ দুঃখে চাকরি নিতে যাবে, বিয়ে করতে চলে আসবি। খবর টের পায়নি তাই—তুই গেলি সে বলে কত জনার বুক-ফাটা নিশ্বাস উঠবে, ছুটে চলে যাবে সেই গাঁয়ে আবার তোকে বন্দী করে আনার জন্য।

ঠেস দিয়ে কার কথা বলে মঞ্জুলা [illegible] আবার সে—সমর ডাক্তার। সমরকে নিয়ে গুঞ্জন আছে এদের মধ্যে। কাশিয়ারি পোস্টমাস্টারের ভাইঝি মংলা—দীপালী [illegible] নাকি [illegible]। একদা, সমরের বেশি রকম যাতায়াত ছিল ওদের বাড়ি। তারপরে মনকষাকষি—শোনা যায় [illegible] সঙ্গে।

কী কান্না কাঁদল কাঞ্চন যাবার দিনে। সকল স্বপ্ন গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিয়ে চলে যাচ্ছে। মামী আঁচলের প্রান্তে চোখ মুছিয়ে দেন। যত মোছেন, আপনি তত ভেসে যান।

বেণুধর বোনকে নিয়ে পৌঁছে দেবে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অধীর হয়ে উঠল—বিদায়পর্ব সারা হয় না কিছুতে। বিরক্ত কণ্ঠে বলে, কান্নার কি আছে রে? যাচ্ছিস নিজেদের বাড়ি, যাচ্ছিস বাবার কাছে। ভাবখানা, বনবাসে চললি যেন তুই।

জ্যোৎস্না বকে ওঠেন বেণুকে: গাঁ-ঘরের কথা মনে আছে নাকি ওর? বাপকেই বা চিনল কবে ভাল করে? সত্যি সত্যি বনবাসে যাওয়া। অমন করে তাড়িয়ে তুলিস নে বেণু। কাঁদে তো কাঁদুক, কেঁদে কেঁদে খানিক হালকা হোক।

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন : আমরা গুহাবাসে চললাম, মেয়ে চলল বনবাসে।

আঁচলে চক্ষু মার্জনা করে কাঞ্চন তাড়াতাড়ি বলে, তোমরা কোথায় গিয়ে উঠবে, আমায় অন্তত ঠিকানাটা দাও। আমার যাবার তো উপায় রইল না, গ্রাম থেকে চিঠিপত্তর দেবো এক-আধখানা।

আমি জানিনে মা, ঠিকানা উনি আমাকেও বলেন না। কি বলেন জানিস। পর্বতের গুহায় থেকে হাইকোর্টের তদ্বির হয় না, তাহলে সত্যি সত্যি সেখানেই আস্তানা নিতাম। তা শহরের উপরেই সেইরকম গুহা খুঁজে বেড়াচ্ছেন। মুখ দেখাবেন না লোকের কাছে। পেয়েছেন একটা যদ্দূর জানি। তুই যাচ্ছিস। দু-চার দিনের মধ্যে আমরাও চলে যাব আমাদের সেই জায়গায়।

গোপাল সামন্ত পুরনো আরদালি। তার উপরে মামার সবচেয়ে বিশ্বাস—বোধকরি মামীর চেয়েও। গোপালকেও কাঞ্চন চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করেছে। না, সে কিছু জানে না। পাকাপাকি হয়নি সম্ভবত। আর গোপালের জানা মানে তো ঘরের এই দেয়ালটা কি ঐ আলমারিটার জানা—টুঁ-শব্দটি বেরুবে না তার মুখ দিয়ে।

কাঞ্চনকে জ্যোৎস্না সাজিয়ে দিচ্ছেন। হাল আমলে বেশি গয়না মেয়েদের অপছন্দ। যে ক'খানা আছে সমস্ত পরিয়ে দিলেন তিনি।

সজল চোখে হেসে কাঞ্চন বলে, শাড়িও যত আছে, একের পর এক জড়িয়ে দাও মামী।

সত্যিই তাই আমার ইচ্ছে করছে। একটা শাড়ি পরে এসে দাঁড়ালি। বদল করে আবার একটা পরে আসবি। ফের আবার। যাবার আগে সমস্তগুলো শাড়ি পরিয়ে এক একবার দেখে নেবো।

সারা দিনমান কেটে যাবে মামী, আজকে আর যাওয়া হবে না। খেলাও নয়। চল্লিশটা মেয়ে নিয়ে সেই যে ফ্যাশান-প্যারেড করেছিল, আমার একলাকে দিয়ে তাই হবে।

জিনিসপত্র দিয়ে তারপর ট্যাক্সিতে উঠল। স্যুটকেশই পাঁচটা—

বেণুধর বলে, উঃ, মহারাণীরও এমন হয় না রে! গাঁয়ের মানুষের চোখ ঠিকরে যাবে।

কেন?

এত সাজসজ্জা কোন জন্মে তারা দেখেছে নাকি? ভাবতে পারে না, একটা মানুষের জন্য এত সব লাগে।

॥ দুই ॥

খান দুই খোড়োঘর নিয়ে শৈলধরের বাড়ি। নড়বড়ে বেড়া, ঝড়-বাতাসে খড়ের ছাউনি খানিক খানিক উড়ে গেছে। বৃষ্টি হলে টপটপ করে ঘরের মধ্যে জল পড়ে, জিনিসপত্র এদিক-ওদিক নাড়ানাড়ি করতে হয়। বাইরের বৃষ্টি থেমে যায়, ঘরের বৃষ্টি তারপরেও অনেকক্ষণ ধরে চলতে থাকে। মেরামতের উদ্যোগ নেই শৈলধরের। টাকাই বা কোথা? মেয়েদের শ্বশুরবাড়িগুলো বিগড়ে যাওয়ার আগে ঘরেরও কোন প্রয়োজন ছিল না—কুটুম্বর ঘরে দিব্যি আরামে কাটত।

সেই ভাঙাঘরে শহরের ঝকমকে মেয়ে কাঞ্চন।

গ্রামসুদ্ধ রটনা হল, গ্রামের বাইরেও গেল কথাটা—সাজপোশাক কাকে বলে, দেখে এসো শৈলধরের বাড়ি গিয়ে। হেন তাজ্জব কাণ্ড, শহরে যাদের যাতায়াত তাদের দেখা থাকতে পারে, কিন্তু গ্রাম নিয়ে যারা পড়ে আছে তাদের চোখে নতুন। ঘন ঘন কাপড়-জামা বদলায়—দিনের মধ্যে পাঁচ-সাতবার। কখনো আকাশের রং, কখনো রক্তের রং, কখনো ছাইয়ের রং, কখনো বা সর্ষেফুলের রং।

সান্তু-দি টিপ্পনী কাটেন: বিকারের রোগির ওষুধ বদল করে ডাক্তারে—সকালে লাল অষুধ, সন্ধ্যেয় গোলাপি অষুধ, দুপুরে সাদা অষুধ—সেই জিনিস আর কি!

বিজয় সরকার কলকাতার আমদানি। হাইকোর্টের ভূতপূর্ব উকিল নিয়ে গ্রামের গর্ব—তাঁরই কনিষ্ঠ সন্তান। বাপের সঙ্গে তারাও সব ভুধসরের ঘরবাড়িতে এসে উঠেছে। অভাব-অনটন নেই—খায়দায়, কাজকর্মের অভাবে ডাম্বেল-মুগুর নিয়ে শরীরচর্চা করে, এবং ফুলের বাগানে মাটি কোপায়। তার কানে পৌঁছল কথাটা।

স্বভাবতই ফুলের উপমা মনে এসে যায় বিজয়ের। কাঞ্চনের সঙ্গে গিয়ে আলাপ করে : ফ্যাশানও কলকাতার—

তাই বলি! সেইখানে কাছাকাছি এগিয়েছেন। আর যত আছে, সামনে পড়লে সরে যায়। শতেক হাত দূর থেকে জুল জুল করে দেখে। বুনো মানুষ নই আমি। জিজ্ঞাসা করবেন তো কি দেখে অমন করে তাকায়—বাঘ-ভালুক, অপ্সরী-কিন্নরী নাকি পেত্নী শাকচুন্নী?

হ্যাঁ! বলো কি ভাবেন? হাসতে হাসতে বিজয় সাঙ্গ দিল কথাটা। শুনিয়ে দিল।

কাঞ্চন রাগে না, হেসেই খুন।

বিজয় এবারে নিজের কথা শোনায় : আমি ফুলের তুলনা দিলাম — সকালবেলা গোলাপ আপনি, দুপুরে বোগেনভেলিয়া, সন্ধ্যা হলে সন্ধ্যামণি—

ফুলের পথ বাঁধা আপনাদের। কিন্তু রাগ করবেন না, আপনার উপমা মানায় না। ওদের উপমায় নতুনত্ব আছে।

হাসিখুশির মধ্যে অনেকক্ষণ কথাবার্তা চলল। বনবাসের মধ্যে এতদিনে মানুষ পেয়ে গেল একটা। শহরের মানুষ, কাঞ্চনের আপন মানুষ।

কৈফিয়ত দিচ্ছে কাঞ্চন : কি করব বলুন, এক-কাপড়ে বেশিক্ষণ থাকতে পারিনে। অস্বস্তি লাগে, গা ঘিনঘিন করে।

থাকতে যাবেনই বা কেন? এদের কথার ভয়ে? মাছি-পিঁপড়ে জ্ঞান করবেন এদের। পায়ে জুতো পরেন, তা-ও এদের চোখে নতুন। তাই নিয়েও কথা।

কাঞ্চন বলে, মাটিতে ব্যথা লাগে পায়ে—অভ্যাসদোষ। পাখনা নেই যে, তা হলে উড়ে উড়ে বেড়াতাম।

বড়বাড়ির জিমনাস্টিক-করা ছেলে—কাঞ্চনের কাছে শুনে এসে

বিষম তড়পাচ্ছেঃ অসভ্য বর্বর যত। সাতজন্মে যেন মেয়ে দেখেনি। জুল-জুল করে তাকিয়ে অপ্সরী-কিন্নরী দেখে। গুঁতিয়ে মুখ থেঁতলে চোখগুলো ভোঁতা করে দেবো, দাঁড়াও—

তারাপদ-গোমস্তা চাপচুপি মন্তব্য করে: গ্রামশুদ্ধ কানা না করে একজনকে সামলানোই ঢের সোজা।

শৈলধর মেয়েকে বলেন, বেরোবার কি দরকার তোর শুনি? ঘরের কাজকর্ম নিয়ে থাকবি—

ওদের ভয়ে? হেসে কাঞ্চন উড়িয়ে দেয়। আমি তো উল্টোটাই ভাবছি বাবা। বেশি করে ঘুরব, যত খুশি দেখুক। দেখলে গা হাত-পা ক্ষয়ে যাবে না।

এর পরে কাঞ্চন সেজেগুজে জুতো খটখট করে সকলকে দেখিয়ে দেখিয়ে বেশি করে গ্রামের পথে ঘুরে বেড়ায়।

আলোচনা আরও তুমুল হয়ে ওঠে। মেয়েটার সুঠাম চেহারা নিয়ে, তার কাপড়চোপড় নিয়ে, গাত্রবর্ণ নিয়ে। শহরের উপর আরামে থেকে দুধ-ঘি আঙুর-আপেল খেয়ে [illegible] চেহারা খুলে যায়। দামী কাপড়চোপড় বড়লোক মামা জুগিয়ে এসেছে—সে চাকের মধু ফুরিয়ে গেছে এখন। যেগুলো নিয়ে এসেছে পুরানো হয়ে ছেঁড়াছুটে যাক, তারপরে আমাদেরই মতন কস্তাপেড়ে শাড়ি ধরবে। কৌটো কৌটো মলম ঘষে আর এসেন্স ছিটিয়ে গায়ের বর্ণ, গায়ের গন্ধ। খরচা করে এই তদ্বির কদ্দিন আর বজায় রাখবে—ছ-মাস ছ'মাস যেতে দাও, প্রতিমার জৌলুষ গিয়ে খড়মাটি বেরিয়ে পড়বে তখন।

একটা মানুষ শোনা যাচ্ছে আত্মহারা একেবারে। সে হল নিরঞ্জন। কাঞ্চনের দুর্দশায় বড় আনন্দ তার। হেসে হেসে নিরঞ্জন নাকি বলে বেড়াচ্ছে, দিব্যি হল, শৈল-কাকা ঘরদোর সেরে নিল। আমরাই সাথেসঙ্গে থেকে করে দেবো। সোমত্ত মেয়ে ভর করেছে,

বলেনি কখনো কিছু। বেড়ানো সেরে আজকে কাঞ্চন উঠানে পা দিয়েছে— দেখে, নিরঞ্জন আর শৈলধর সেই সময়টা দাওয়া থেকে নামছেন।

কাঞ্চন বলে, আপনার সঙ্গে কথা আছে নিরঞ্জনবাবু।

নিরঞ্জন বলে, শুনেছি বটে নীলমণির কাছে। কিন্তু বাবু বলছ কেন, আমার মধ্যে বাবু দেখলে কোন্‌খানটা? জামা নেই, জুতো নেই, পায়ে এক-হাঁটু ধুলো, ক্ষৌর হয়নি আজ দশ-বারো দিন। শহরে না-ই থাকি, বাবু কিছু কিছু দেখা আছে বই কি!

ফ্যা-ফ্যা করে হাসে। আবার বলে, মানুষের উপর খাতির করে বাবু বলছ, নীলমণিকে বলেছ তো উল্টো কথা। নরাকারে পশু একটি আমি।

শৈলধর লজ্জায় তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন: না, কখনো নয়। বাজে কথা, মিথ্যে কথা। ওসব কেন বলতে যাবে, বিশেষ করে তোমার মতন ছেলের নামে।

কিন্তু মেয়ের মুখে তাকিয়ে প্রতিবাদে জোর আসে না। থেমে পড়লেন।

কাঞ্চন বলে, বাড়ির উপর ওঠে কি মতলবে? শহরের বাসা ছেড়ে কোন্ সুখে আছি, চোখে দেখতে বুঝি? দেখে মজা লাগে?

নিরঞ্জন কি একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল, তার আগে শৈলধর ধমকে ওঠেন: আমি খবর দিয়ে এনেছি। তুই ক্যাট-ক্যাট করবার কে রে? বাড়ি আমার না তোর?

চুপ হয়ে গেল কাঞ্চন। ঘাড় নেড়ে শৈলধরের কথায় সায় দিয়ে নিরঞ্জন পরম তৃপ্তিতে উপভোগ করছে।

শৈলধর বলছেন, বেণু দশ টাকা করে পাঠায়, আমার দুধে আফিঙেই প্রায় তা লেগে যায়। ক্ষেতের চাট্টি ধান, দু-দুজন লোকের একেবারে তার উপরে নির্ভর করে থাকা চলে? তারই একটা ব্যবস্থা দেখছি। বুড়োবয়সে না খেয়ে মরব, তা-ই কি চাস তুই?

নিরঞ্জন একগাল হেসে সঙ্গে সঙ্গে সুসংবাদ দিল : বালিকা-বিদ্যালয়ের হেডমিস্ট্রেস হয়ে যাচ্ছ যে তুমি—

অবাক হয়ে কাঞ্চন বলে, বালিকা-বিদ্যালয় আপনাদের এই গাঁয়ে ? কোথায় বিদ্যালয়—দেখিনি তো ! কানেও শুনিনি।

নেই এখনো। তবে তুমি এসে পড়েছ, হতে কি আর বাকি থাকবে ?

সগর্ব দৃষ্টি তুলে বলতে লাগল, তোমায় পেয়ে গেছি, দন্তে তৃণ ধরিয়ে ছাড়ব এবার সুজনপুরকে। পোস্টাপিস নিয়ে ওদের বড্ড দেমাক। পোস্টাপিস আপাতত পেরে উঠছিনে—পিওনমশায় যদ্দিন বর্তমান আছেন। বালিকা-বিদ্যালয়ে এইবার পোস্টাপিসের শোধ তুলে নেবো।

কাঞ্চন ভ্রূভঙ্গি করে বলে, কদিন থাকি আপনাদের গাঁয়ে দেখুন। কলকাতা ছেড়ে এসেছি, কিন্তু কত আপন-লোক সেখানে আমাদের—কাজকর্ম কিছু না কিছু হবেই। হলে যেখানকার মানুষ সেখানে চলে যাব।

একটু থেমে নিরঞ্জনের মুখের দিকে মুহূর্তকাল তাকিয়ে কি দেখল। বলে, বাবাকেও নিয়ে যাব, গাঁয়ে একলা পড়ে থাকতে দেবো না। দাদাকেও মেস থেকে সরিয়ে সকলে একসঙ্গে বাসা করে থাকব। এ বাড়ির দরজায় তালা ঝুলবে।

নিতান্ত সে ভয়-দেখানো কথা, তা-ও মনে হয় না। পিওন-মশায়ের পেট-মোটা ব্যাগই তার প্রমাণ। হাটবারের দিন সুজনপুর থেকে ব্যাগ ভরতি এক গাদা চিঠি নিয়ে আসেন। আবার নিয়েও যান এক গাদা চিঠি ডাকে ফেলবার জন্য। কাঞ্চন গাঁয়ে আসবার আগে এর অর্ধেক বোঝাও পিওনমশায়কে বইতে হত না।

পিওনমশায়ও ঠিক এমনি বলেন, চিঠি মেয়েটার নামে আসে যেমনি লেখেও নিজে তেমনি। মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর এই বড্ড দোষ—কাজকর্ম নেই তো লেখ বসে বসে চিঠি। বিয়ে হয়ে ও-মেয়ে যাদের ঘরে যাবে, চিঠি লিখে লিখেই তাদের ফতুর করে দেবে।

পিওনমশায়ের কথা আগে নিরঞ্জন নিস্পৃহ ভাবে শুনে যেত। আজকে কাঞ্চনের কথাবার্তা শোনার পর আতঙ্ক হল রীতিমতো।

নিরীহ চিঠি নয় সে-সব। কলকাতার আপন-লোকদের কাছে চিঠি লিখে লিখে পালানোর ষড়যন্ত্র।

কাঞ্চন স্পষ্টাস্পষ্টি কলহ করে: গাঁয়ের নরককুণ্ডে পড়ে থেকে আমি জীবন খোয়াব? কখনো না, কখনো না। আমি সে মেয়ে নই। হেডমিস্ট্রেস তো করেছেন, তার জন্য মত নিয়েছেন আমার?

নিরঞ্জন অবাক হয়ে বলে, ও শৈল-জেঠা, আপনার মেয়ে বলে কি শুনুন। আপনি বলে দিয়েছেন, তাতে নাকি হয়নি। উনি মস্ত বড় সমঝদার হয়েছেন, ওঁর মতামতও চাই।

গ্রামের নিন্দেয় চটে গেছে, কৌতুক-হাসি হেসে নিরঞ্জন তারই শোধ নেয়। বলে, এদ্দিন মামার বাসায় ছিলে, মামা মতামত দিতেন। এখন বাবার কাছে আছ, মত তারই কাছে নিতে এসেছি। ভাইয়ের কাছে যদি থাক, সে মত দেবে। বিয়ে হওয়ার পরে শ্বশুর-বাড়ির মতামত। মেয়েলোকের নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা থাকে নাকি যে ঘটা করে মত চাইতে আসব? বারো হাত শাড়ি পরেও কাছা দেবার বুদ্ধি আসে না, তার আবার মত!

বলতে বলতে অভিমান উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল: জানো না বলেই দুধসরকে তুমি নরককুণ্ড বলে দিলে। এইটুকু গ্রাম অতবড় সুজনপুরের সঙ্গে সমানে টক্কর দিয়ে যাচ্ছে। ওদের মুন্সেফ আছে, আমাদের সাবজজ। ওদের ডাক্তার, আমাদের তেমনি ইঞ্জিনিয়ার। আমাদের রায়সাহেব তো ওদের দারোগা—কোন্‌টা বড়, তুমিই বিবেচনা করে দেখ। উকিল-মোক্তার দুরকম আছে সুজনপুরে। আমাদের ছিল শুধু উকিল—কিন্তু সে হল হাইকোর্টের উকিল, সুন্দর-বনের আসল মানুষখেকো। একজনেই দুয়ের ধাক্কা নিলেন। শুধু এক পোস্টাপিস নিয়ে ওরা জিতে রয়েছে—পিওনমশায় শাপশাপান্ত দেবেন, সেই ভয়ে ওদিকটা কিছু করতে পারিনে। তারই শোধবোধ

এবারে—বালিকা-বিদ্যালয়। দুটো পাশ-করা হেডমিস্ট্রেস তুমি—সুজনপুর এ জিনিস পাবে কোথায়? শিক্ষিত মেয়ে চাইলেই তো আর মেলে না।

চিন্তিতভাবে বলে, পিওনমশায়ের মেয়েটাকে সদরে নিয়ে পড়াচ্ছে। সুজনপুরের মধ্যে ঐ এক শিবরাত্রির সলতে। পড়ছে ম্যাট্রিক। সে মেয়ে জানা আছে আমার। পিওনমশায়ের ছেলের সঙ্গে খাতির-ভালবাসা—একফোঁটা বয়স থেকে ভাইবোন দুটোকেই জানি। মেয়ের মাথার মধ্যে গোবর, ইহজন্মে পাশ হতে হবে না।

একটু চুপ করে থেকে আবার বলে, পাশ যদি করেও তবু আমাদের নিচে। দুধসরের মেয়ে দু-দুটো পাশ, সুজনপুরের কুলো একটা। তুমিও এই ফাঁকে আরও একখানা দুখানা পাশ মেরে নিও, ধরে ফেলতে না পারে। তার উপরে এই যে এক মজার কল বানানো হল—বালিকা-বিদ্যালয়। পাশ-করা মেয়ে তোমাতেই শেষ হয়ে যাচ্ছে না, ভবিষ্যতে আরও বিস্তর আসবে। বিদ্যালয়ে তার বীজ পোঁতা হল। আক্কেলগুড়ুম এবার সুজনপুরের, মাথায় হাত দিতে বসবে।

সাগরেদ নীলমণি ইতিমধ্যে দুই-তিন বার উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে গেছে। কি জানি, কী দরকার। বাইরে থেকে আবার এখন ঐ হাতছানি দিচ্ছে। সাগরেদ বটে নীলমণি, সেই সঙ্গে গুপ্তচরও। জরুরী খবর নিশ্চয় কোন রকম। অতএব কথাবার্তায় আপাতত ইস্তফা দিয়ে হন হন করে নিরঞ্জন শৈলধরের বাড়ি থেকে বেরুল।

নিভৃতে এসে নীলমণি বলে, এক কাণ্ড হল নিরঞ্জনদা। বাঁশতলায় উকিলমশায় ফটিক-বেহারার সঙ্গে ফুসফুস-গুজগুজ করছিল। আমায় দেখে চুপ। চোখ টিপে দিল বোধহয় উকিলমশায়, ফটিক সর্দার বাঁশবন ভেঙে তাড়াতাড়ি মাঠে নেমে পড়ল। উকিলে বেহারায় অত কি কথা, তখন থেকে তাই ভাবছি।

নিরঞ্জন বলে, বিজয়ের বিয়ের নাকি একটা ভাল সম্বন্ধ এসেছে।

কনে নিজে দেখতে যাবেন, তাই বোধ হয় পালকি-বেহারার বন্দোবস্ত করছিলেন।

তা বাঁশতলায় দাঁড়িয়ে কেন ? আমায় দেখে ছুটেই বা পালায় কেন ফটিক ? ধরেছি তারপর ফটিককে তার বাড়ি গিয়েঃ উকিল-মশাই তোকে কি বলছিলেন ? আমতা-আমতা করে জবাব দেয়ঃ এই শরীরগতিকের কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন আর কি ?

নিরঞ্জনের মনে এখন বালিকা-বিদ্যালয়ের সমস্যা। অন্য প্রসঙ্গের ঠাঁই নেই। অন্যমনস্কভাবে বলল, তাই একটা-কিছু হবে। নয়তো কি আর ফটিক-বেহারার সঙ্গে দেওয়ানি-ফৌজদারি আইনের বিচার হচ্ছিল ?

ঘাড় নেড়ে নীলমণি বলে, তা বলে উকিলমশায় ডাক্তারও নন যে অতক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শরীরগতিকের কথা হবে।

একটু থেমে আবার বলে, আমার সন্দ হয়, কনে দেখা-টেকা নয়—উকিলমশায় কোন একখানে পাকাপাকি পালাবার তালে আছেন। চিরকাল শহরে কাটিয়ে গাঁয়ে আর টিকতে পারছেন না।

উকিলমশায় মানে পুরঞ্জয় সরকার—ভূতপূর্ব হাইকোর্টের উকিল। দুধসর যাঁদের নিয়ে জাঁক করে, তাঁদের মধ্যে প্রধান একটি। নিরঞ্জনের কথায় সুন্দরবনের মানুষখেকো।

রীতিমত পশারওয়ালা উকিল পুরঞ্জয়, দুহাতে রোজগার করতেন। বাড়ি দুধসর তো বটেই—বাল্যকালটাও নাকি এখানেই কাটিয়েছেন। কিন্তু কৃতী হবার পর গ্রামে কোনদিন আসেননি। নিরঞ্জন তা বলে ছাড়বার পাত্র নয়। প্রতিবছর বিজয়া-দশমীর পর তাঁকে এবং অন্য সকলকে প্রণাম জানিয়ে চিঠি লিখে এসেছে। জবাব আসেনি, অতবড় মানুষের কাছে প্রত্যাশাও নেই তার। এবং চিঠি শুধু নয়, কলকাতায় গেলে দুধসরের গৌরব উকিলমশায়ের বাসায় যাবেই সে একবার। এক কাপ চা হয়তো কখনো কখনো এসেছে, তার উপরে নয়।

চলছিল এমনি। বছর তিনেক আগে থেকে অবস্থা একেবারে বিপরীত। উকিলমশায়ের ঘোরতর বৈরাগ্য এসে গেল। চিরজীবন মিথ্যা আচরণে কত শত অসৎ মক্কেল বাঁচিয়েছেন, পাপের সহায়তা করেছেন। হঠাৎ খেয়াল হল, দিন ফুরিয়ে পারের ঘাটে বসেছেন এবার, অবশিষ্ট পরমায়ুর মধ্যে জীবনের পাপ-অন্যায় যথাসম্ভব মেরামত করে নেবেন। প্র্যাকটিশ. মক্কেল-মুহুরি, কলকাতার বাসা ছেড়েছুড়ে দিয়ে তুধসরে এসে উঠেছেন, জপতপ ধর্মকর্ম ছাড়া কিছু জানেন না। অসুবিধা বিন্দুমাত্র নেই। মেয়েরা সুপাত্রে পড়ে শ্বশুরঘর করছে। বড় ছেলে অজয়ের বিয়েথাওয়া হয়ে নাতি-নাতনি দেখা দিচ্ছে। ছোট ছেলে বিজয়ের বিয়ে এখনই হতে পারে—গাদা গাদা সম্বন্ধ আসছে। গিন্নির দাবিদাওয়ার জন্যে সামান্য আটকে রয়েছে। তুধসরের পৈতৃক বাড়ি আগাগোড়া মেরামত করে দোতলার উপর তিনটে নতুন কুঠুরি দিয়ে নিয়েছেন। নতুন সম্পত্তি কিনেছেন আরও কয়েকটা। নিলাম ডেকে খেয়াঘাট ইজারা নিয়েছেন। এই সমস্ত নেড়েচেড়ে ছেলে দুটির দিব্যি কেটে যাবে; চাকরি-বাকরি ব্যাপার-বাণিজ্য কোন কিছুই করবার আবশ্যক হবে না। হেন অবস্থায় যদি পুরঞ্জয় পরকাল নিয়ে মেতে থাকেন, কারো কিছু বলবার নেই।

হচ্ছেও তাই বটে। সর্বক্ষণ শাস্ত্রগ্রন্থ ও পুজোআচ্চা নিয়ে আছেন তিনি। সংসারে সকলের মধ্যে থেকেও পুরোপুরি অধ্যাত্ম-রাজ্যে বাস। আবার ঈশ্বরে যদি কখনো অরুচি আসে, মুহূর্তে সংসারে ঢলে পড়বেন, তার ব্যবস্থাও হাতের কাছে রয়েছে। কিন্তু এত থেকেও নাকি পোষাচ্ছে না। চিত্ত বিচলিত। সংসার এবং তুধসর গ্রাম ত্যাগ করে চলে যাওয়ার জন্য ফটিক-বেহারার সঙ্গে শলাপরামর্শ—

হবে না সেটা আমি থাকতে। নিরঞ্জন খিঁচিয়ে উঠল: যেতে হলে এই বয়সে শ্মশান ছাড়া অন্য কোথাও নয়। তার জন্য ফটিক-

বেহারা লাগে না—চালিতে শুয়ে লোকের কাঁধে চেপে চলে যাবেন। চিতেয় গিয়ে শোবেন। আর এক হতে পারে ভস্ম মেখে বিবাগী হয়ে শ্মশানে গিয়ে ওঠা। তাতে আপত্তি নেই, গ্রামের মধ্যেই শ্মশান। তার জন্যেও কিন্তু পালকি লাগে না, পায়ে হেঁটে ড্যাং-ড্যাং করে চলে যাবেন।

নীলমণির বাক্সে সন্দেহ নিঃশেষে উড়িয়ে দিয়ে এবারে আসল সমস্যায় আসে: বালিকা-বিদ্যালয়ের বন্দোবস্ত সারা। মাস্টার ঠিক হয়ে গেছে। এক মাস্টার আপাতত ঐ কাঞ্চন। শৈল-জেঠার মত পেয়ে গেছি।

নীলমণি বলে, তোমার ইস্কুল যে বসবে, জায়গার ঠিক হয়েছে? চেয়ার-বেঞ্চি? মেয়ে যারা সব পড়তে আসবে?

হাত নেড়ে অবহেলার ভঙ্গিতে নিরঞ্জন বলে, আসবে সব পরে পরে। ঘোড়া হলে চাবুকে আটকায় না রে! আসলটাই হয়ে গেল-- ইস্কুলের মেয়েমাস্টার। সুজনপুর আর সব পারবে, মাথা খুঁড়ে বের করুক দিকি এই জিনিস একটা। সে আর হতে হয় না। মেয়েমাস্টার মুড়িমুড়কি নয় যে দোকান থেকে কিনে আনলাম। পিওনমশায়ের মেয়ে ললিতা—তার বেরিয়ে আসতে অনেক দেরি। গাধা মেয়ে, পাশই করতে পারবে না দেখিস।

নীলমণি মনের পুলক ধরে রাখতে পারছে না। ছ-মাইল দূরের সুজনপুরে তখনই চলে যেতে চায়। বলে, ওদের বাজারখোলায় বসে গল্প করে আসিগে। গ্রামময় চাউর হয়ে যাবে দেখতে দেখতে। হিংসেয় ছটফট করবে।

সে সব পরে। না বললেও টের পেয়ে যাবে তারা। মাথায় যে মস্ত দায় নিয়ে এলাম, সেই ভাবনা ভাব নীলমণি। মাস্টারের মাইনে পনের টাকা। মাইনের চুক্তি পাকা করে নিয়ে শৈল-জেঠা তবে মত দিয়েছে—ওর থেকে সিকিপয়সাও গ্রামসেবার চাঁদা বলে কাটা চলবে না। কাটতে চাও তো বিশটাকা মাইনে—পাঁচটাকা তাই

থেকে চাঁদা বাবদে বাদ। শৈল-জেঠা ঘড়েল কি রকম বোঝ। মাস্টার নিযুক্ত হয়ে গেল—কাঁটা ঘুরতে লেগেছে আজকের তারিখ থেকেই। মাস গেলে নাট পনের টাকা কোথায় পাওয়া যায় বল্।

ভেবে নিয়ে আবার বলে, সাগুদি আছেন তাঁর কাছে কর্জ চাওয়া যায়। আর আমার নিজের যা ছিল, গিয়ে টিয়ে এখনো আছে বোধহয় বিঘে ছয়েক ধান-জমি—

নীলমণি ঘাড় নেড়ে প্রবল আপত্তি করে: সাবজজ উকিল রায়সাহেব হুধসরের এতসব রয়েছে—বিধবা বেওয়া-মানুষে সাগুদির ঘাড়ে গিয়ে পড়া কেন? তোমার নিজের ভ-বিষে নিয়েই বা উদ্বেগ কিসের? এর পরেও কতবার কত দায় ঠেকাতে হবে তোমার—

উপায় বাতলে দে তবে

॥ তিন ॥

জানে না নীলমণি—পাকা উপায় ইতিমধ্যে বাতলানো হয়ে গেছে। বাতলে দিয়েছে সে-ই। ঐ পুরঞ্জয় উকিলমশায়ের বৃত্তান্ত। নিরঞ্জন কানে নিল না বটে, কিন্তু ফিসফিসানির রকমটা নিজ চোখে দেখে সেই থেকে নীলমণির মোটেই ভাল ঠেকছে না।

তক্কে তক্কে আছে নীলমণি। প্রহর খানেক রাত্রে ফটিক সর্দারের বাড়ি উঁকি দিয়ে দেখল, উঠানে পালকি। পালকি এমনি এমনি থাকে না, কোনখানে রওনা হবার মুখে ভাড়া করে নিয়ে আসে। নাঃ, ঘুমিয়ে পড়ে থাকলে হবে না—ব্যাপার যা-কিছু, সুনিশ্চিত এই রাত্রের মধ্যেই।

ঠিক তাই। শেষরাত্রে নীলমণি নিরঞ্জনের দরজায় এসে পড়ল: শিগগির ওঠো নিরঞ্জনদা। সর্বনাশ হল, মানুষ পালিয়ে যাচ্ছে।

নিরঞ্জন লাফিয়ে উঠে বলে, বলিস কি রে?

দেখ গিয়ে কী কাণ্ড চলেছে বাঁশবাগানের অন্ধকারে। উকিলমশায় চললেন—চালি চেপে যাচ্ছেন না, পায়ে হেঁটেও নয়। দস্তুরমতো পালকি-বেহারা হাঁকিয়ে।

বয়সে বুড়ো তায় এত বড় সম্ভ্রান্ত মানুষ, কী শয়তানি তাঁর দেখ। ফটিক-বেহারার সঙ্গে ষড়যন্ত্র হয়েছে—পালকি এনে তারা নামিয়েছে বাড়িতে নয়, রশিখানেক দূরে বাঁশবাগানের ভিতর। বাড়ির লোকে ঘুণাক্ষরে যাতে টের না পায়। টের পেলে বাগড়া দেবে। পুবের দিককার সর্বশেষ কামরায় পুরঞ্জয় পুঁথিপত্র, পূজোর সরঞ্জাম এবং ঠাকুরদেবতা নিয়ে নিরিবিলি থাকেন—জিনিসপত্র বেঁধে তৈরি হয়েই ছিলেন। ফটিক এসে বোঁচকা মাথায় তুলে নিল, হন হন করে তিনি ফটিকের পিছু পিছু চললেন। এই অবস্থায় আবছা মতন দেখতে পেয়ে নীলমণি ছুটতে ছুটতে এসেছে: একটা চোর-

হঁ্যাচোড়কেও ছাড়তে চাও না নিরঞ্জনদা, আর এমন হাঁকডাকের মানুষটা গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। এক্ষুনি চল, আটকানোর ব্যবস্থা লহমার মধ্যে করে ফেলতে হবে। নয়তো বড্ড লোকসান।

বাঁশতলায় ঢুকল দুজনে। পালকি সেই মুহূর্তে বাঁশবাগান ছেড়ে মাঠের উপর নামল, মাঠ ধরে তীরের বেগে ছুটেছে। ব্যবস্থা সেই রকম। একদল ডাকাত যেন মহামূল্য ধনসম্পত্তি বগলদাবায় পুরে রাত্রিশেষে ছুটে পালাচ্ছে।

তখন গেল দুজনে পুরঞ্জয়ের বাড়ি। উঠানে এসে সর্বপ্রথম নজরে পড়ল, পূবের কামরার খোলা-দরজা হা-হা করছে। গলা ফাটিয়ে চিৎকার: ঘুমোচ্ছ তোমরা অজয়-বিজয়! সর্বনাশ হয়ে গেল তোমাদের—

পুরঞ্জয়ের দুই ছেলে—অজয় আর বিজয়। তারা এবং বাড়িসুদ্ধ সকলে বেরিয়ে পড়েছে।

কি, কি?

সদ্য ঘুম-ভাঙা চোখে সর্বনাশটা ঠিকমতো ঠাহর করতে পারে না। বিহ্বল হয়ে এদিক-সেদিক তাকায়।

পূবের কামরায় আঙুল দেখিয়ে নিরঞ্জন হাহাকার করে ওঠে: কী কাল ঘুমরে বাবা! দরজা খুললেন, জিনিসপত্তোর একের পর এক বের করে দিলেন, জলজ্যান্ত মানুষটা তারপর বিবাগী হয়ে চিরকালের মতো চলে গেলেন—এত কাণ্ড হয়ে গেল, একবাড়ি মানুষের মধ্যে কারো একটু হুঁশ হল না!

পাড়ার মানুষ ছুটোছুটি করে আসছে। বিষম হৈ-চৈ, ভিড় দস্তুরমতো। গিন্নি জয়মঙ্গলা পূবের কামরায় শূন্য খাটে কাঠের উপরে মাথা ভাঙাভাঙি করছেন: ওরে নিমকহারাম মানুষটা, সারা জন্ম এত সেবা করলাম, মুখের কথাটা বলে যাওয়ারও পিত্যেশ হল না? কুঞ্জঙ্গির শিবদুর্গাই কেবল তোমার আপন হল, আমরা কেউ নই—ঠাকুর-ঠাকরুনকে ঝোঁচকায় ভরে নিয়ে চোরের মতন সরে পড়লে?

স্বামী-বিচ্ছেদের হা-হুতাশে সকলের চক্ষু সজল হয়ে ওঠে। ছোট-ছেলে বিজয় কেবল বাপের দিক হয়ে কথা বলেঃ যথার্থ মহাপুরুষ মা, কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা। অকথা-কুকথা বলতে নেই। ধর্মের নামে বুদ্ধদেব গৃহত্যাগ করেছিলেন, বাবাও করলেন। সংসার অসার—বুদ্ধদেব সেটা কাঁচা বয়সেই ধরে ফেললেন। এর কিছু সময় লাগল সর্বরকম গোছগাছ হয়ে যাবার পর। সে তো ভালোই—কারো অনুযোগের কারণ রইল না।

এত লোকের এত রকম বাদবিতণ্ডার মধ্যে মাথা ঠাণ্ডা কেবল নিরঞ্জনের। বিচার করছেঃ মাঠ ভেঙে পালকি-বেহারা উত্তর মুখো ছুটল। যেতে পারে কোথায়? খুব সম্ভব দোমোহনীর ঘাটে। সেখানে নৌকো ঠিক করা আছে। কে করে এসব বন্দোবস্ত? ঐ ফটকে-বেহারা ছাড়া কেউ নয়। শলাপরামর্শ হচ্ছিল, নীলমণি স্বচক্ষে দেখেছে। নৌকা দোমোহনী থেকে রেলস্টেশনে নিয়ে তুলে দেবে। রেলে একবার চড়তে পারলে দুনিয়া তখন পায়ের তলায়—খুড়ি, চাকার তলায়। সাগরদ্বীপে গিয়ে তপস্যায় বসেন কিম্বা হিমালয়ের গুহায় ঢুকে যান, কেউ আর তখন পাত্তা পাবে না।

বিচার সকলেরই মনে ধরল।

নিরঞ্জন বলে, আমি আগে আগে ছুটলাম। গিয়ে সামলাইগে। আসল যুদ্ধের আগে বাগযুদ্ধ—সেই জিনিস হতে থাকবে খানিকক্ষণ। দল জুটিয়ে তার মধ্যে তোমরা সব এসে পড়ো। দেরি হয় না যেন, খবরদার। দোমোহনীর ঘাটে অনেক নৌকো, বিস্তর মাঝিমাল্লা। মাঝিতে মাঝিতে সাট থাকে, দরকার হলে বৈঠা উঁচিয়ে একজোট হয়ে দাঁড়ায়। যদ্দূর পার দল জুটিয়ে চলে এসো। বুড়োহাবড়া বাচ্চা-ছেলে অবলা-রমণী নয়—বাছা বাছা জোয়ান-মরদ। নিরস্ত্র কেউ যাবে না—যা পাও, হাতে নিয়ে চলে এসো।

পাথুরে জোয়ান নিরঞ্জন নিজেই, গায়ে অসুরের বল। দোমোহনী পর্যন্ত দু মাইল পথ একটানা দৌড়েছে, মুহূর্তকাল জিরোয়নি। পালকি অল্পক্ষণ ঘাটে পৌঁছেছে, পালকি থেকে নেমে পুরঞ্জয় তখনো নৌকার মধ্যে জুত হয়ে বসতে পারেননি। এমনি সময় ঝড়ের বেগে নিরঞ্জন গিয়ে পড়ল।

গাছের সঙ্গে কাছি দিয়ে নৌকো বাঁধা। ছুটে এসে নিরঞ্জন সর্বাগ্রে সেই কাছি দু-হাতে জড়িয়ে ধরল : কার ক্ষমতা কাছি খুলতে আসে, রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে তার আগে। পুরঞ্জয়ের দিকে কটমট চোখে তাকায়। গ্রাম ছেড়ে যে মানুষ চলে যেতে চায়, হোন না হাইকোর্টের উকিল, তাঁর সঙ্গে আর খাতির কিসের? এক নম্বরের শত্রু তিনি।

বলে, রাতে রাতে বেরুনো হল, দুধসরের কেউ টের না পায়। কাজটা হয়ে দাঁড়াল পুরোপুরি চোরাই বৃত্তি—ধর্ম-ধর্ম করা হয় তবে কি জন্যে?

পালকি থেকে বোঁচকাবিঁড়ে দু-হাতে ঝুলিয়ে ফটিক-বেহারা এই সময়টা নৌকোয় এনে তুলছিল। নিরঞ্জন ছুটে গিয়ে ঠাস করে তার গালে এক চড়। চড় মেরে মুহূর্তে ফিরে এসে যথাপূর্ব কাছি এঁটে ধরেছে।

পুরঞ্জয় গর্জন করে ওঠেন : এই নিরঞ্জন, বড় যে আস্পর্ধা! সর্দার-বেহারার গায়ে তুই হাত তুললি। আমারই চোখের উপর। ফৌজদারির কারণ ঘটেছে, জানিস সেটা? আমি সাক্ষ্য দিয়ে তোকে জেলে পুরতে পারি।

নিরঞ্জনও সমান তেজে জবাব দেয় : এই বেটাই হল আসল সিঁধেল। দুধসরের মানুষ রাতের বেলা চুপিসারে সরাচ্ছে। চোর মারলে ফৌজদারি হয় না। সরাচ্ছে তা-ও আপনার মতো মানুষ—হাইকোর্টের উকিল বলে যাঁর নামে এত বড় জাঁক আমাদের। ঘটিচোর-বাটিচোর নয়, বেটা একেবারে মণিমাণিক্যের ঘরে সিঁধ

দিয়েছে। আমি একলা বলে কি—গ্রামবাসী যে হাতের মাথায় পাবে, সে-ই তো ঠেঙাবে ওকে।

মগের মুলুক পেয়েছে, না? ঠেঙাক না বঝি কত বড় সব বাপের বেটা! আমি যেন অস্থাবর মাল, একজন কেউ সরিয়ে নিচ্ছে। সংসারের নরককুণ্ডে থাকব না, স্বেচ্ছায় সুস্থ শরীরে সংসার ত্যাগ করে যাচ্ছি।

নিরঞ্জন বলে, তা পালকি না চড়ে হিল্লিদিল্লি না করে বুঝি সংসার-ত্যাগ হয় না? গাঁয়ের উপর অত বড় জাগ্রত মহাশ্মশান—জটাজুট ধারণ করে ভস্ম মেখে কত কত মহাপাতকী সেখান থেকে তরে গেল। বলি, জীবন-ভোর কত মহাপাতক করেছেন, যে দেশ-দেশান্তর না ছুটলে সে পাতকের ক্ষয় হবে না?

বাগযজ্ঞ ইচ্ছে করেই লম্বা করছে। বলছে, আর পথের দিকে ব্যাকুল হয়ে তাকাচ্ছে। আসে কই নীলমণি আর অজয়-বিজয়েরা দলবল জুটিয়ে নিয়ে? করছে কী তারা এতক্ষণ ধরে? তর্কাতর্কি থামলে সঙ্গে সঙ্গেই তো জোর-জবরদস্তির কথা উঠবে। নিরঞ্জন একা, আর ও-তরফে ফটিকেরা আট বেহারা আর দাঁড়ি-মাঝিও জন ছয়েক। ঘাটের অপরাপর নৌকোর কথা ছেড়ে দাও।

পুরঞ্জয় বলেন, যাচ্ছি কাশীধামে। ওরে মুখ্যু, গরীব তপস্বী যারা ভাড়ার পয়সা জোটাতে পারে না গেঁয়ো-শ্মশানে পড়ে তারাই গুলতানি করে। কাশী হল শিবস্থান—চোখ বুঁজলেই শিবলোক-প্রাপ্তি। জপতপ কিছু লাগে না—স্রেফ গঙ্গাস্নান, ক্ষীর-মালাই সাপটানো, আর হল বা সাঁঝের বেলা একটিবার বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণা দর্শন।

নিরঞ্জন সুর নামিয়ে বলে, বেশ! ছুধসর কানা করে চলে যাচ্ছেন, ক্ষতিটা পুষিয়ে দিয়ে যান। তাহলে আর কিছু বলব না।

ভোর হয়ে আসে, মানুষজন এক্ষুনি জেগে পড়বে। মজা দেখতে মানুষ এসে জমবে। তার আগে গোলমালটা চুকিয়ে ফেলা যায়

যদি। আশান্বিত হয়ে পুরঞ্জয় বলেন, কি চাস তুই বল্‌, অসাধ্য না হলে দিয়ে দিচ্ছি। নিয়ে-থুয়ে নৌকোর কাছি ছাড়। পরমার্থিক কাজে বাগড়া দিতে নেই রে! ঈশ্বর চটে যান।

নিরঞ্জন বলে, আমার জন্যে কি—আমার নিজের কিছু নয়। ভূধসর গাঁয়ের দাবি। হাইকোর্টের উকিল আছেন এমন কথা বুক ফুলিয়ে আর বলা যাবে না। তার বদলে বলব বালিকা-বিদ্যালয় আছে। সেই বিদ্যালয়ের সাহায্য দিয়ে যেতে হবে আপনাকে। নইলে ছাড়াছাড়ি নেই।

পুরঞ্জয় অবাক হয়ে বলেন, বালিকা-বিদ্যালয় আবার কোথা? আমি তো জানিনে—

আছে ঠিকই। মাস্টার অবধি নিযুক্ত হয়েছে—একদিনের মাইনে আট আনা পাওনাও হয়ে গেছে তার। আপনাদের জানবার অবস্থায় আসেনি এখনো। তারই কিছু ব্যবস্থা করে যেতে হবে। তবে ছাড় পাবেন।

পুরঞ্জয় তাকিয়ে আছেন নিরঞ্জনের দিকে। ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আরও একটু ভেবে নিয়ে নিরঞ্জন বলে, খেয়াঘাটের যে নতুন ইজারা নিলেন, তার উপস্বত্ব বালিকা-বিদ্যালয়ে দান করে যান। মাসে মাসে মাস্টারনির মাইনে, আর দশ রকমের খরচ-খরচা অনেকখানি সঙ্কুলান হয়ে যাবে। খেয়াঘাটের আয় আগে ছিল না, ধরে নিন এখনো নেই।

হুঁ-হুঁ গোছের একটা অস্পষ্ট আওয়াজ পুরঞ্জয়ের মুখে, মানে তার কিছুই দাঁড়ায় না।

নিরঞ্জন রেগে গেল: এই সামান্য মুনাফাটা ছাড়তে পারেন না, আপনি আবার সংসার ছেড়ে ভগবান নিয়ে থাকবেন! ফিরে তো এলেন বলে। কাশীর রিটার্ন-টিকিট কাটবেন, গাড়িভাড়ার দিক দিয়ে সাশ্রয় হবে। কিন্তু আমিও বলে দিচ্ছি, সাহায্য দিলেন আর না-ই দিলেন, পুরঞ্জয় বালিকা-বিদ্যালয় আমাদের চলবেই।

পুরঞ্জয় বিরক্ত কণ্ঠে বলেন, আবার পুরঞ্জয় জুড়ে দিয়েছিস বিদ্যালয়ের সঙ্গে ? নামের ঘুষ দিয়ে টাকা নেওয়ার ফিকির। তবে আমি এক পয়সাও দিচ্ছিনে। লোকে বলবে, সৎকর্মে দেয়নি—নামের লোভে দিয়েছে। ভবসংসারে বিতৃষ্ণা, ওরে, নামের লোভ কি দেখাস আমায় ! পুরঞ্জয় নাম তুলে দে, বিবেচনা করে দেখব।

নিরঞ্জন বলে, নাম থাকবে, পয়সাও দেবেন। না দিয়ে কেমন করে পারেন দেখি।

কলহ রীতিমত। ভোর হয়ে গেছে, বাছুর হাম্বা-হাম্বা করে কাঁদের গোয়ালে। নিরঞ্জন কাছি দু-হাতে ধরে বীরমূর্তিতে দাঁড়িয়ে।

সহসা কলরব কানে আসে—এসে পড়ল এইবার তবে দুধসরের দল। আর নিরঞ্জনকে পায় কে ? গলার জোর আরও চড়িয়ে বলে, পুরঞ্জয় জুড়ে দিয়েছি আপনার খাতিরে নয়, আমার গ্রামের গরজে। পুরঞ্জয়টা কে হে—এদেশ-সেদেশের মানুষ জিজ্ঞাসা করবে কিনা, হাইকোর্টের উকিল—দুধসরের মানুষ। অনেক ভেবে কায়দাটা বের করেছি, এক ঢিলে দুই পাখি বধ—বালিকা-বিদ্যালয় হল, সেই সঙ্গে হাইকোর্টের উকিলও থেকে গেল।

দলবল ঘাটে এসে পড়েছে। পুরঞ্জয়ের দুই ছেলে তার মধ্যে। অবলা রমণী বাদ দেবার কথা—তবু একজন এসে পড়লেন, পুরঞ্জয়ের স্ত্রী জয়মঙ্গলা। মোটা থলথলে শরীর—পাকা চুলের মধ্যে সিঁথি-ভরা সিঁদুর। এই মানুষের পক্ষে এত দূরপথ পায়ে হাঁটা—দুই ছেলে দু-পাশ দিয়ে মায়ের হাত ধরেছে, কী ভাবে যে চলে এসেছেন নিজেই ভাবতে পারেন না এখন। নীলমণি পরে একদিন এই প্রসঙ্গে বলেছিল, রমণী হতে পারেন, কিন্তু অবলা কে বলে সরকার-গিন্নিকে ? এসে ভালই হয়েছিল। নিরঞ্জনের দোসর পাওয়া গেল একজন। রণের মাঝে দুই সেনাপতির দু-রকম কায়দা।

গিন্নি গর্জন করে এসে পড়লেনঃ বারো বছর বয়সে শ্বশুরঘর করতে আসি, সেই থেকে একটা দিনও কাছছাড়া হইনি। অন্তিম বয়সে

আজকে গাঁটছড়া খুলতে চাও তো এত সহজে হবে না সে জিনিস। ঈশ্বরে নিতান্তই যদি টেনে থাকেন, উচিত ব্যবস্থা করে তারপরে বেরুবে। ছেলে আর বউয়ের হাত-তোলা হয়ে থাকতে পারব না। আবাগির বেটি তো চিঁড়ের মতন দাঁতে ফেলে আমায় চিবাতে চায়।

বলতে বলতে জয়মঙ্গলা চেপে বসলেন নৌকোর খোপে : কার কত ক্ষমতা আছে, কে নড়াতে পারে দেখা যাক।

আর নিরঞ্জন ওদিকে কাছি ধরে চেঁচাচ্ছে : পুরঞ্জয় বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্যে খেয়াঘাটের মুনাফা। ফুধসর এত-দরের একজন বাসিন্দা হারাচ্ছে, তার ক্ষতিপূরণ।

বড়ছেলে অজয় কেটে কেটে বলে, ছেলে-বউ নাতিপুতি ভাসিয়ে দিয়ে দরের মানুষ রাত্তিরবেলা পোঁটলা নিয়ে টিপিটিপি বেরিয়ে পড়ে, এমন তো দেখিনি বাবা। ধর্ম কেবল মুখে মুখে, বজ্জাতি বুদ্ধি ষোল আনা আছে। এককাঁড়ি ভূসম্পত্তি বিনি-বন্দোবস্তে পড়ে রইল, আবার এই খেয়াঘাটের আবদার উঠেছে—মরি আমরা হাঙ্গামা-হুজ্জুত করে, মামলা করে করে লয় পেয়ে যাই!

বিজয়ও বাপকে ফেরাতে চায়, কিন্তু তার উল্টো সুর : খেয়াঘাটের ইজারা ইস্কুলের নামে লেখাপড়া দিয়ে তবে যেও বাবা। নয়তো গোলমাল ঘটাতে পারে।

এবং মাথার মধ্যে এখনো বুদ্ধের কথা ঘুরছে। অজয়ের দিকে ভ্রূকুটি করে বলে, বুদ্ধদেব তো কত বেশি দরের মানুষ। তাঁর গৃহ-ত্যাগটাও ভেবে দেখ। তিনি কি দিনদুপুরে যাত্রামঙ্গল পড়ে বেরিয়ে-ছিলেন?

অজয় খিঁচিয়ে ওঠে : এই একটা তুলনা হল নাকি? বুদ্ধের মাথার উপরে ছিলেন শুদ্ধোধন—আমাদের বাবার উপরে আর একটা বাবা এনে দাও, তাহলে কিছু বলব না। ধর্মপথে যাচ্ছেন, তাতে কেউ নারাজ নয়। তার আগে মায়ের ব্যবস্থা হোক, বোন-ভাগনে-ভাগনিরা এসে পড়বে, তাদের কি দেবেন দিয়েথুয়ে যান। বউটা প্রাণপাত

সেবাযত্ন করে, সে-ও কি আর ছিটেফোঁটার প্রত্যাশী নয়? এর পর সকলে আমাদের সন্দেহ করবে—বলবে, শলা করে দু-ভাই আমরা সমস্ত সম্পত্তি মেরে বসে আছি।

দোমোহনী থেকে পুরঞ্জয়ের ফিরতে হল অতএব। ফিরলেন হাঁটা-পথে। পালকিতে জয়মঙ্গলা।

বিষয়ী মানুষের বিবাগী হতে গেলেও বিস্তর ঝঞ্ঝাট। স্থাবর-অস্থাবর যাবতীয় বস্তুর বিলিব্যবস্থা ও লেখাপড়ায় অনেক দিন কাটল। নিরঞ্জন মাঝে মাঝে শাসিয়ে যায়: খেয়াঘাট যাচ্ছে তো ইস্কুলের নামে? ঘাট থেকে নইলে কিন্তু আবার ফিরতে হবে।

খেয়াঘাটের ব্যাপার নিয়ে আবার অজয় বিজয়ে বিরোধ। বিজয় বলে, দিয়ে দাও বাবা শিক্ষা-বিস্তারের কাজে। বালিকা-বিদ্যালয়ের অজুহাতে একটা শিক্ষিত মেয়ে গ্রামে থেকে যাবে, সে জিনিসও বড় কম নয়। তার আদর্শে আর দশটা মেয়ের চাড় হবে। টাকার অভাবে মাইনেপত্তর না পেলে কলকাতায় ফিরে যাবে আবার। বালিকা-বিদ্যালয় উঠে যাবে—গ্রাম অন্ধকার।

ভাইয়ের কথা শুনে অজয় ভ্রূভঙ্গি করে: হুঁ, বুঝেছি। শিক্ষা নিয়ে বড্ড মাথাব্যথা—বলি, নিজের বেলা ছিল কোথা? তিন-তিনবার ফেল হয়ে এলি। বলতে পারিস, পুরুষ-শিক্ষা নয়—স্ত্রীশিক্ষা। ফুটফুটে মাস্টারনি তাহলে গাঁয়ের উপর থেকে যায়, গাঁ থেকে চাই কি আমাদের দালানে এসে ওঠে শেষ পর্যন্ত। ঘাস খাইনে, বুঝি রে বুঝি ভিতরের মতলব!

বাপের কাছে গিয়ে অজয় ঘোরতর আপত্তি জানায়: বিয়ে থাওয়া দিয়েছ, বাচ্চার পর বাচ্চা এসে দিনকে-দিন খরচ বাড়ছে না! এখন আমার—এর পর বিজয়েরও আসবে। খেয়াঘাটের উপস্বত্বে হাট-বাজারটা তবু চলবে। নাম দিতে দিয়েছ বাবা, সেই তো ঢের। তার উপরে আর কিছু দিতে হবে না, নাম ভাঙিয়ে যা পারে করে নিক।

যুক্তিতে যাই হোক, নিরঞ্জনের দলটাকে চটাতে সাহস হয় না। ভয় দেখিয়েছে, ত্রিমোহনীতে যতবার নৌকোয় উঠবেন, কাছি টেনে আটকাবে। যে রকম ষণ্ডামর্ক, কাছি টেনে নৌকো চাড় করে ডাঙার উপরে তুলে ফেলাও বিচিত্র নয়। তা ছাড়া আরও এক বিবেচনা—নাম জুড়ে দিয়েছে, বালিকা-বিদ্যালয় উঠে গেলে সেটা পুরঞ্জয়ের মৃত্যুর শামিল। বুড়ো হয়েছেন, মরবেন তো শিগগিরই। এটা হবে দ্বিতীয় মৃত্যু।

খেয়াঘাটের ইজারা অতএব বালিকা-বিদ্যালয়ের কমিটির নামে লেখাপড়া করে দিতে হল। ছেলেমেয়ে নাতিপুতি সকলেরই যথা-যোগ্য ব্যবস্থা হয়েছে। এর পরে পুরঞ্জয় কাশীধামে যান আর রসাতলে যান, কারো বিশেষ আপত্তি নেই। বিলিবন্দোবস্তে মাস দুই কাটল, তার পর একদা দিনদুপুরে সমারোহ করে সকলের চোখের উপর দিয়ে পুরঞ্জয় কাশীধামে চললেন। মেয়েরা সব ছেলে-পুলে নিয়ে এই উপলক্ষে শ্বশুরবাড়ি থেকে চলে এসেছে। টিব-টিব করে একের পর এক পায়ের গোড়ায় প্রণাম করে। পুরঞ্জয় একখানা করে পাঁচ টাকার নোট জন প্রতি মিষ্টি খেতে দিয়ে যাচ্ছেন।

সর্বশেষে জয়মঙ্গলা। পায়ের ধুলো নিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বললেন, যেতে লাগো আমিও আসছি পিছন ধরে। বিজয়ের বিয়ে দিয়ে চলে যাব। কোন গেঁজে বিনি-পণে কোন হাড়হাবাতের মেয়ে এনে তুলবে। মাস্টারনি হয়ে একটা তো চোখের উপরেই ঘুরঘুর করছে। আমি থাকতে হতে দিচ্ছিনে। বড়বউয়ের হাড়-জ্বালানো কথা শুনেও পড়ে আছি তাই। বিজয়ের বউকে সংসারে বসিয়েই চলে যাব আমি। বাসা ঠিক গঙ্গার উপরে চাই কিন্তু—দশাশ্বমেধ-ঘাটের আশেপাশে। ঘর যেন উপরতলায় না হয়, সিঁড়ি ভাঙতে বুক ধড়ফড় করে। গোছ-গাছ করতে লাগো গিয়ে, বছর খানেকের বেশি আমার দেরি হবে না।

॥ চার ॥

মাস্টারনির মাইনে যোগাড় হয়ে গেল, এবারে ঘর। বালিকা-বিদ্যালয় বসবে যেখানটা।

নিরঞ্জন বলে, সাবজজ আছেন তুধসরে, ইঞ্জিনিয়ার আছেন, রায়সাহেব আছেন—আমাদের আবার ঘরের ভাবনা! বাইরে বাইরে চাকরি ওঁদের, বাড়িতে ইঁদুর-চামচিকের আড্ডা। চামচিকে তাড়িয়ে ইস্কুল বসাব।

সাবজজ বাবুর দরদালান আয়তনে দিব্যি বড়, ইস্কুলের কাজের পক্ষে চমৎকার। খালি বাড়ির পাহারায় একজন গোমস্তা—নীলমণি সকাল সকাল খেয়ে ছিপ-সুতো নিয়ে তার কাছে হাজির: বিলের কুয়োয় পুঁটিমাছ টানে টানে উঠছে। চলুন যাই গোমস্তামশায়।

মাছ-মারায় গোমস্তার বড় পুলক। কাজও নেই হাতে। ধানের মরশুমে ভাগচাষীর কাছ থেকে হিসাবপত্র বুঝে ধান আদায় করা, বাকি সময় শুয়ে-বসে কাটানো। ছিপ নিয়ে নীলমণির সঙ্গে গোমস্তা বিলে বেরিয়ে পড়ল।

খালুই-ভরা মাছ নিয়ে সন্ধ্যাবেলা মহাস্ফূর্তিতে ফিরল। নীলমণি নিজের বাড়ির দিকে বাঁক নিয়েছে। একা গোমস্তা দরদালানের দরজার সামনে এসে অবাক—সাইনবোর্ড ঝুলছে: পুরঞ্জয় বালিকা-বিদ্যালয়। এর বাড়ি তার বাড়ি থেকে বেঞ্চি-চেয়ার এনে ঘরের সমস্তখানি ভরে ফেলেছে।

কী সর্বনাশ!

নিরঞ্জন ভিতরেই ছিল, হাসি-হাসি মুখে বেরিয়ে আসে: ভালই তো হল। বিদ্যাস্থান—পুণ্যের জায়গা।

বাবু কিছু জানলেন না—পুণ্যস্থান অমনি হলেই হল! আমায় যে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়াবেন—মাইনে দিয়ে রেখেছে কি খালে ফেলে

পুঁটিমাছ বেড়ানোর জন্যে ?

নিরঞ্জন বলে, বাবু কি সেই জলপাইগুড়ি বসে বসে দেখবেন ? আসেন যদি কখনো সাইনবোর্ড খুলে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারের বাড়ি লটকে দেবো। বালিকা-বিদ্যালয় সেইখানে তখন। ইঞ্জিনিয়ারও যদি আসেন, তখন রায়সাহেবের বাড়ি। দুধসরে বাড়ির অভাব আছে ? যদি বলেন এখনই কেন যাইনি ? মস্তবড় আপনাদের দরদালান, বিদ্যালয় একটা ঘরেই কুলিয়ে যাবে। ঐ সব বাড়িতে দুটো তিনটে ঘর লেগে যায়। এক মাস্টারের পক্ষে অসুবিধা। বিদ্যালয় বড় হয়ে গণ্ডা গণ্ডা মাস্টার আসুক। তখন না হয় সরিয়ে নেওয়া যাবে।

গোমস্তা কাতর হয়ে বলে, দুপুরে নিরিবিলি আমি ঘুমোই। কানের কাছে ভ্যাজোর-ভ্যাজোর করবে—

নিরঞ্জন অভয় দিল: বালিকা কোথায়—ভ্যাজোর-ভ্যাজোর করছে কে শুনি ? ইঁদুরেও তো কিচকিচ করে বেড়ায়, তার বেশি গোল হবে না আমি এই কথা দিলাম তোমায়।

বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী, ঘর, চেয়ার-বেঞ্চি সবই হয়ে গেল —বাকি রইল শুধু বালিকা। ঘরের কাজকর্ম ছাড়িয়ে মেয়ে কেউ ইস্কুলে দিতে চায় না। সে যাকগে, ইস্কুল তো চলতে থাকুক— সুজনপুরের আক্কেলগুড়ুম হয়ে যাক। সরকারি সাহায্য নিচ্ছিনে যে ইনস্পেক্টর পরিদর্শনে আসবে, হাজিরা-বইয়ে বালিকা দেখাতে হবে। গুচ্চের বালিকা নিয়ে হাট বসানোর মানে হয় না—কাজ চলতে থাকুক, গোমস্তা নিরুপদ্রবে দিবানিদ্রা দিন, বালিকা ধীরে-সুস্থে জমবে।

কিন্তু মুশকিল দাঁড়িয়েছে শিক্ষয়িত্রী কাঞ্চনকে নিয়ে। লেখাপড়া জানা ডবকা মেয়েকে কিছুমাত্র বিশ্বাস নেই—চালচলন অতিশয় সন্দেহজনক। ভাগ্যবশে গ্রামে এসে পড়ল, বাপের ইচ্ছায় হোক

নিজের ইচ্ছায় হোক চাকরিও নিয়ে নিয়েছে, মাসে মাসে পনের টাকা বেতন। তারই উপর ভরসা করে বালিকা-বিদ্যালয়—ছটফটানি তবু কিন্তু গেল না। চিঠিপত্র সমানে চলেছে, পিওনমশায় বয়ে বয়ে নাজেহাল।

পিওন অটল হালদার বয়সে বৃদ্ধ। সবাই সম্মান করে। কিন্তু কাঞ্চনের নামের গাদা গাদা চিঠি নিয়ে আসেন। এবং নিয়েও যান কাঞ্চনের লেখা একগাদা চিঠি। এই কারণে নিরঞ্জন বিগড়ে যাচ্ছে। বলে, যতই হোন সুজনপুরের বাসিন্দা। বিপক্ষ গ্রাম বলেই শত্রুতা সাধছেন।

নীলমণি পিওনমশায়ের হয়ে তর্ক করে: ডাকে চিঠি আসে, না এনে কি করবেন বলো।

নিরঞ্জন বলে, পথের ধারে কত নালা-ডোবা। বোঝা হালকা করে এলে কে দেখতে যাচ্ছে! নিজের গাঁয়ের দায় হলে করতেন তাই।

বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। ইচ্ছে করে নীলমণি, ডাকাতি করে পিওনমশায়ের চিঠির ব্যাগ ছিনিয়ে নিই। দেখো ঠিক একদিন—

নিয়ে দেখবে কী রহস্য কাঞ্চনের এসব চিঠিপত্রে। ছুধসরের নিন্দেমন্দ যদি থাকে, চিঠির লেখিকা ও বৃদ্ধ পিওন কাউকে রেয়াৎ করবে না। কিন্তু বিপদ হয়েছে পোস্টাপিস হল গবর্নমেন্টের, পিওন-মশায় সরকারি লোক—হাঙ্গামা করতে গেলে সেটা রাজবিদ্রোহের ব্যাপার দাঁড়িয়ে যাবে।

ছুধসরে পোস্টাপিস নেই, বসানোর চেষ্টাও হয়নি ওই পিওন মশায়ের খাতিরে। এই একটা ব্যাপারে সুজনপুরের কাছে হার সুজনপুর সাব-পোস্টাপিসের অধীনস্থ ছুধসর গ্রাম। হপ্তার মধ্যে রবি মঙ্গল আর বিষ্যুৎবারে ছুধসরের হাট। হাটের নামডাক আছে, মাছ-তরকারি বেশ ভাল আমদানি হয়। পিওনমশায় হাট করতে

এসে চিঠি বিলি করে যান। ডাকবাক্সে যত চিঠি পড়ে, ব্যাগে ঢুকিয়ে নেন—পরের দিনের ডাকে চলে যাবে। এবং খাম-পোস্টকার্ড-টিকিটও হাটে বসে বিক্রি করেন মাছ-তরকারির মতো।

এই অটল পিওন আজকের মানুষ নন। চিরকাল ধরে এই নিয়মে চিঠি বিলি হয়ে আসছে। হাটের তিন দিন ভোরবেলা খঞ্জনপুর থেকে বেরিয়ে পড়বেন। পথ তিন ক্রোশ, কিন্তু পৌঁছুতে বেলা দুপুর। সোজাসুজি এসে গেলেই হল না, পথের এধারে ওধারে গ্রামগুলো বিটের মধ্যে পড়ে। উভয় দিকে সারতে সারতে এলেন।

দুপুরবেলাটা দুধসরে স্থিতি, গ্রামের মেয়েপুরুষ সবাই তাঁর আপনার। এক একদিন এক বাড়ি সেবা। আগের তারিখে বলে গেছেন, মঙ্গলবারে তোমাদের ওখানে। রাঁধাবাড়া সেরে গামছা তেলের বাটি সাজিয়ে সে বাড়ির লোক বসে আছে। আকাশে বরঞ্চ সূর্য ওঠার ভুল হতে পারে, কিন্তু অটল পিওন যথাকালে বাড়ির সামনে এসে হাঁক দেবেন : এসে গেছি বউমা।

কারো যদি খেয়াল না থাকে—পিয়নমশায়ের গলা শুনে মনে পড়ল, দুধসরের হাট আজকে, সন্ধ্যায় হাটে যেতে হবে। এখন আর পিওনমশায়ের একতিল সময় নষ্ট করার জো নেই—মাথায় এক থাবড়া তেল দিয়ে পুকুরে পড়ে ঝুপঝুপ করে ডুব সেরে, নাকে-মুখে চাট্টি ভাত গুঁজে এক-ছুটে গিয়ে পাশায় বসে পড়া।

আশ্চর্য পাশা খেলেন পিওনমশায়। লিকলিকে রোগা মানুষটি—কিন্তু গলায় শঙ্খের আওয়াজ। হাঁক দিয়ে পাশার দান ফেললেন—শুকনো হাড়ের বস্তু হয়েও পাশা বুঝি ভয় পেয়ে যায়। কচ্চেবারো বললেন তো পাশায় ঠিক তাই পড়েছে, ছ-তিন নয় বললেন তো তাই। দুধসরেও মুরুব্বি পাণ্ডুড়ে আছেন ক'জন, একসঙ্গে সকলের জমে ভালো। হাটবারের দুপুরের জন্য উভয় পক্ষ মুকিয়ে থাকেন।

গাছের আগায় রোদ উঠেছে, আসন্ন সন্ধ্যা। পাশার ছক-গুঁটি

তুলে ফেলে এইবারে হাটে রওনা। দস্তুরমতো বড় হাট, অমন বিশখানা গাঁয়ের মানুষ এসে জোটে। হাটে এসে অটল পিওন সকলের আগে নিজের হাটবেসাতি সেরে নেন। তারপর এক দোকানের ভিতর জায়গা ঠিক করা আছে—ল্যাম্পো জেলে সেখানে বসে পড়লেন। চারিদিক থেকে লোক এসে ভিড় করে: আমাদের কি আছে দিয়ে দাও পিওনমশায়। গোটা গ্রামের চিঠি অটল হালদার একজনের হাতে দিয়ে দিচ্ছেন। সে কিছু ভারী জিনিস নয়—কোন গ্রামে হয়তে সাকুল্যে একখানা চিঠি, কোন গ্রামে কিছুই নেই। ঐ সঙ্গে খাম-পোস্টকার্ডও পাতান দিয়ে বসেছেন, যার যা দরকার নিয়ে নিতে পার।

ডাক বিলি ও খাম-পোস্টকার্ড বিক্রির কাজ শেষ করে সাথী খুঁজে নিয়ে সারাদিনের পর অটল পিওন এবারে সুজনপুর ফিরলেন। সাথী বিস্তর, হাট করতে সব এসেছে, ধামা-ভরতি হাট-বেসাতি কাঁধে হাতে নিয়ে লণ্ঠন ঝুলিয়ে দল বেঁধে গল্প করতে করতে সব যাচ্ছে। পিওনমশায় তাদের মধ্যে ভিড়ে যান।

ভুধসরে পা দিয়েই কলকাতার পড়ুয়া মেয়ে কাঞ্চন ভ্রূ কুঁচকে বলেছিল, কী জায়গা রে বাবা! খবরের কাগজ আসে তিন দিনের বাসিপচা খবর নিয়ে। একখানা পোস্টকার্ড কিনবে তো কবে হাটবার হা-পিত্যেশ করে থাকো। এই গ্রাম নিয়ে আবার দেমাক! তবু ভাগ্য, হাট হপ্তায় একদিন না হয়ে তিনটে দিন।

অটল পিওন যতদিন বর্তমান আছেন পোস্টাপিসের উদ্যোগ করবে না, মোটামুটি এইরকম ঠিক আছে। কিন্তু মেয়েমানুষের এ হেন অপমানের বাক্যে সহিষ্ণুতা বজায় রাখা দায়। নিরঞ্জনের রোখ চেপে উঠল: তবে তো লাগতে হয় রে নীলমণি। ভুধসরের বাঘাজালকো মানুষ সব আছেন—অঙ্গুলিহেলনে যাঁরা পোস্টাপিস তো পোস্টাপিস লাট সাহেবের বাড়ি তুলে এনে বসিয়ে দিতে পারেন।

পিওনমশায়ের কানে উঠে গেল, পোস্টাপিস বসাবে এবার ছুধসরে। নিরঞ্জনকে বললেন, কী কথা শুনতে পাচ্ছি বাবা? দু'দান পাশা খেলে যাই, সেই পথে কাঁটা দিতে চাও?

ছুধসরে পোস্টাপিস হলেও আপনার আসতে বাধা কিসের? এসে খেলবেন পাশা।

অটল পিওন বলেন, কাজকর্ম না থাকলে চাকরিতে কি জন্যে রাখবে? ছেলেও সেইটে চায়। সদরের উপর বাসা করে বউমাকে নিয়ে গেছে, বোনকে নিয়ে পড়াচ্ছে। বুড়োবুড়ি আমরা ভিটেয় পিদ্দিম দিচ্ছি সেটা চক্ষুশূল ওদের ভাই-বোনের। তক্কেতক্কে আছে, নিয়ে তুলতে পারলে হয়। চাকরি নেই শুনলে একটা দিনও আর গাঁয়ে তিষ্ঠোতে দেবে না।

কাতর হয়ে বলেন, শহরে গিয়ে উঠলে আমি তো বাবা ধড়ফড়িয়ে মরে যাব।

সেটা বোঝে নিরঞ্জন। এই বয়সে নিজের ভিটে ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে বসত করা—সে যেন বড়ো গাছ উপড়ে তুলে ভিন্ন জায়গায় নিয়ে বসানো। সে গাছ বাঁচে না, পাতা ঝরে ছুদিনে শুকিয়ে যায়। নিরঞ্জনের কাঁচা বয়স—সে-ও তো পারে না ছুধসর ছেড়ে অন্য কোথাও আস্তানা নিতে। কোনদিন পারবে না।

অটল পিওন কাকুতিমিনতি করছেন, নিরঞ্জন চেপে গেল আপাতত। চিরকাল এক নিয়মে তিনি চিঠি বিলি করে আসছেন। কেউ বলে, কলিযুগের গোড়া থেকেই, মারা পড়বেন কলি কাবার হবে যেদিন। কেউ বলে, অত নয়—চাকরি ওঁর বছর চল্লিশের এবং আরো কি চল্লিশটা বছর চালাবেন না? তা সে যা-ই হোক, ঠোঁট উলটে কাঞ্চন যাচ্ছে-তাই বলুক, পিওনমশায়ের খাতিরে সবুর না করে গত্যন্তর নেই।

॥ পাঁচ ॥

অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়ল। কাঞ্চনের চিঠি লেখা ও চিঠি পাওয়া দিনকে-দিন বাড়ছে। আর চলে না, প্রতিবিধান একটা না করলেই নয়। মেয়েটা অত কি চিঠি লেখে—চিঠিতে থাকেই বা কি? পোস্টাপিস এই কারণে অন্তত হাতের মধ্যে চাই।

একদিন ভালমানুষের ভাবে নীলমণি কথাটা জিজ্ঞাসা করল। নিরঞ্জনের শেখানো। অশিক্ষিত হ্যাকাবোকা মানুষটাকে তাচ্ছিল্য করে যদি কাঞ্চন কিছু ফাঁস করে।

নীলমণি বলল, অত চিঠি কাকে লেখো দিদিমণি? অত সব মানুষ তোমার চেনা?

হেসে কারে গম্ভীর এক নিশ্বাস ফেলল কাঞ্চন: সারা কলকাতার আমার বয়সি যত মেয়ে, তার অন্তত অর্ধেকগুলো বন্ধু আমার। লেখাপড়া যা করেছি, তার দুনো তেদুনো হৈ-হল্লা করেছি। দুধসর তো জেলখানা রাতদিন শয়নে স্বপনে আমি কলকাতার কথা ভাবি। চিঠি লিখি তাদের। তারাও জবাব দেয়। আজেবাজে কথা সাত লিখেই আনন্দ আমার। চিঠির মধ্য দিয়ে কলকাতা শহরে খানিকটা ঘোরা হয়ে যায়।

একটা চিঠি দৈবাৎ একদিন নীলমণির হাতে পড়ল। পিওন-মশায়ের কাছ থেকে, যেমন হয়ে থাকে, একগাদা নিয়ে কাঞ্চন বাড়ি ফিরছে। পড়তে পড়তে যাচ্ছে একটা।—সে চিঠি শেষ করে খামের মধ্যে ভরে আর একটা খুলল। পড়া-চিঠিটা অসাবধানে রাস্তায় পড়ে গেছে। পড়বি তো পড় নীলমণির চোখের সামনে।

টুক করে তুলে নিয়ে নীলমণি নিরঞ্জনের কাছে চলে যায়: দেখ তো কী লেখা—আমায় কাঞ্চন সত্যি না মিথ্যে বলেছিল।

পয়লা নজরেই তো ডাহা মিথ্যে একটা ধরা পড়ে। যে মানুষ

লিখেছে তার নাম সমর—রাণীশঙ্করী লেনের সমর গুহ, খামের উপরেই প্রেরকের নাম-ঠিকানা। কলকাতার যে অর্ধেকগুলো মেয়ে কাঞ্চনকে চিঠি দেয়, এই ব্যক্তি তার বাইরে। শহরে মেয়েরা, এবং মেয়ে মাত্রেই, সমরে পারদর্শিনী বটে, কিন্তু নাম কোন মেয়ের সমর হয় না। চার পৃষ্ঠা ঠাসাঠাসি করে যা-সব লিখেছে—লেখককে নাগালের মধ্যে পাওয়ার জন্য নিরঞ্জনের হাত নিশপিশ করে।

নমুনা দু-চার ছত্র :

কী করে যে তোমার বনবাসের ঠিকানা যোগাড় করেছি—এই কর্মে পাকা ডিটেকটিভ ঘোল খেয়ে যাবে। তোমার মামার-বাড়ি গিয়ে দেখি, নতুন ভাড়াটে। কেউ কিছু বলতে পারে না। উদাস হয়ে পথে পথে ঘুরি। পথ কোথা, মরুভূমির তপ্ত বালুকা। একটা মানুষ বিহনে শহর কলকাতা সাহারা হয়ে গেছে। শুধুমাত্র একটি মেয়ে আলো-ঝলমল এত বড় কলকাতা ফুৎকারে নিভিয়ে অন্ধকার করে দিতে পারে, সে আজ স্বচক্ষে দেখছি। দৈবক্রমে মঞ্জুলাকে পেলাম, তাকে তুমি চিঠি দিয়েছ। মঞ্জুলা চিঠি পায়, অথচ আমি পাইনে। জীবন এক মুহূর্তে অর্থহীন হয়ে পড়ল। গঙ্গার পুলের উপর দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ভাবলাম। বিষম শীত পড়েছে, হিমেল হাওয়া। কনকনে জলে ঝাঁপ দেওয়া হল না, বাড়ি ফিরে এই চিঠি লিখছি। জবাব পাই কি না পাই দেখি। গঙ্গা তো শুকিয়ে যাচ্ছে না, আর ইতিমধ্যে ফাল্গুন মাস পড়ে শীতও কমে আসবে—

অসহ্য, অসহ্য! সমর নামে সেই নচ্ছার মানুষটা ঔধসর চর্মচক্ষে দেখেনি, সোনার গ্রামকে তবু বন বলেছে। এখানে থাকা মানে বনবাস। আরও বিস্তর নিন্দেমন্দ। পড়তে পড়তে নিরঞ্জনের হাত নিশপিশ করে—হাতের মাথায় পেলে দিত তার গালে মহাথাপ্পড় কষিয়ে। নেই যখন, মানুষটার চিঠির উপরে শোধ তোলে। ছিঁড়ে কুটিকুটি করে। যেন সমর গুহর-ই হাত ছিঁড়ছে, পা ছিঁড়ছে, চুলের গোছা টেনে টেনে ছিঁড়ছে। এমনিই সামাল দেওয়া যায় না

কাঞ্চনকে, তার উপরে মন উড়ুউড়ু-করা এই সব চিঠি

কাঞ্চন কি জবাব দেবে পরোয়া না করে নিরঞ্জন নিজেই এক জবাব লিখে ফেলল। লিখছেন যেন শৈলধর ঘোষ, কাঞ্চনমালার বাবা: আমার কন্যার নামে বারংবার চিঠি পাঠাইলে তোমার নামে ফৌজদারি সোপর্দ করিব। অধিকন্তু এখান হইতে একদল ঠ্যাঙাড়ে পাঠাইব, তাহারা তোমাকে বস্তাবন্দি করিয়া পুলের উপর হইতে গঙ্গার কনকনে জলে নিক্ষেপ করিবে। বুঝিয়া কার্য করিবে। ইতি। নিত্যাশীর্বাদক শ্রীশৈলধর ঘোষ।

এর পর প্রতি হাটবারে নিরঞ্জন তীক্ষ্ণ নজর রাখে। বুড়ো অটল পিওন কোন এক বাড়ি হন্তদন্ত হয়ে এসে তেল মাখতে বসেছেন, সেই মুখে কাঞ্চন ঠিক এসে দাঁড়াবে। এবং কোন দিনই পিওন-মশায় বঞ্চিত করেন না -খাম-পোস্টকার্ডের চিঠি শুক্তের হাতে দেবেন। খামই বেশি—না জানি কত বিষ ভরতি হয়ে এসেছে ঐসব আঁটাখামের ভিতরে!

দূর থেকে নিরঞ্জন দেখে, আর রাগে গরগর করে। দোষ গবর্ন-মেণ্টের—একপয়সা কি দুপয়সা টিকিটের মূল্য নিয়ে কাঁহা-কাঁহা মুলুকের বৃত্তান্ত হাজির করে দেয়। দোষ ঐ অটল পিওনের—চল্লিশ বছরের মধ্যে একটা হাটও বোধহয় কামাই নেই, পাশার নেশায় হুধসরে এসে পড়ে ঘরে ঘরে সর্বনাশ বিলি করেন। পোড়া রোগপীড়া এমন বুড়োথুথুড়ে মানুষটা চোখে দেখতে পায় না! গতিক যে রকম দাঁড়াচ্ছে, ক্রোধে জ্ঞানহারিয়ে নিরঞ্জনই হয়তো ঠ্যাঙে বাড়ি মেরে কোন একদিন পিওনকে শয্যাশায়ী করবে, উঠে যাতে না আসতে হয় কাঞ্চনের চিঠিপত্র পৌঁছে দেবার জন্য।

বড় একান্ত মনে চেয়ে ছিল বোধহয়—যা চেয়েছে ঠিক তাই। চৈত্রমাসের এক দুপুরে পথের উপর মাথা ঘুরে পড়ে পিওনমশায় সত্যি সত্যি শয্যাশায়ী। দিন সাতেক পড়ে থাকতে হল। সরকারি

ডাক সেজন্য বন্ধ থাকে না, চিঠি জমে জমে স্তূপাকার। ছেলে আর মেয়ে শহর থেকে অবিরত লিখছে : ভারি তো চাকরি—ইস্তফা দিয়ে চলে এসো। চাকরি আর করতে দেওয়া হবে না তোমায়, শুয়ে বসে আরাম করো। সারা জীবন ধরে তো খাটলে, আর কেন?

অটল স্ত্রীকে বলেন, বোঝ ব্যাপার! কারো সর্বনাশ, কারো পৌষমাস। ওরা ভেবেছে, এই মওকায় বাবাকে বাসায় নিয়ে তুলি। গরম আর কদ্দিন, বর্ষা তো পড়ে গেল বলে। ঠাণ্ডার দিনে তখন আর মাথা ঘোরার ভয় থাকবে না।

কিন্তু বর্ষাতেও বিপদ। চিঠি বিলি করতে গিয়ে একদিন অটল পা পিছলে কাদার মধ্যে পড়লেন। এইবারে ঘাবড়ে যাচ্ছেন—আগে কখনো এমনধারা হয়নি। অতিরিক্ত বুড়ো হয়ে গেছেন বোঝা যাচ্ছে, দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চিরজীবন ভূতের খাটনি খেটে এসে এবারে জবাব দিচ্ছে। যে ক'দিন জীবন আছে, ঘরে পড়ে থাকতে হবে—এ-গ্রাম সে-গ্রাম করা যাবে না। ছেলে-মেয়ে ওই যা ভয় দেখিয়ে দিয়েছে—শুয়ে বসে শুধুই আরাম করা।

দেহে যদিই বা কুলায়, ওরা আর খাটতে দেবে না। ছেলে রাখালরাজ আর মেয়ে ললিতা। সেই সঙ্গে বউমাটিও আছেন। রাখালরাজ ইতিমধ্যে বাড়ি এসে বসেছে। সদরের হেড-অফিসে ছিল, তদ্বির করে সে এখন সুজনপুর সাব-অফিসের পোস্টমাস্টার। আর একটা বছর হলে ললিতা পাশ দিতে পারে, তাকে হস্টেলে দিয়ে এসেছে সেজন্য। কষ্টেসৃষ্টে বোনের খরচ চালিয়ে যাবে। এদিকে বাপাকেও আর চিঠির ব্যাগ ঘাড়ে তুলতে দেবে না। ছেলের পাকা-দালানে বসে অফিসের কাজ আর বুড়ো বাপ রোদে বৃষ্টিতে ঘুরে ঘুরে চিঠি বিলি করে বেড়াবেন, এটা কখনো হতে পারে না। মরে গেলেও হতে দেবে না রাখালরাজ।

অবসরের দরখাস্ত নিজেই লিখে বাপের সই নিয়ে পোস্টাল-সুপারিনটেণ্ডেণ্টের অফিসে পাঠাল।

চল্লিশ বছর চাকরির পর বিশ্রাম। যা বলেছিল, সেই জিনিস করে তবে ছাড়ল। শুয়ে বসে থাকা ছাড়া অটল হালদারের অন্য কাজ নেই। এক ছোকরা পিওন অটলের জায়গায় বহাল হয়েছে। তাকে নিয়ে মুশকিল—একবর্ণ ইংরেজি পড়তে পারে না। ইংরেজি ঠিকানা হলে এখানকার চিঠি ওখানে নিয়ে হাজির করবে। তবে ভরসা দিয়েছে, এ অবস্থা থাকবে না। ফার্স্টবুক কিনে মুখস্থ করতে লেগেছে, অটলের কাছে এসে এসে পাঠ নিয়ে যায়। চাকরি পাকা হবার মধ্যেই ইংরেজিটা রপ্ত করে নেবে।

পিওনমশায় যখন রইলেন না তবে আর চক্ষুলজ্জা কিসের? লাগাও পোস্টাপিস। প্রয়োজনও বটে—কাঞ্চনের নামের যে সর্বনেশে চিঠি নীলমণি এনে দেখাল! বালিকা-বিদ্যালয় হয়েছে, এর উপর পোস্টাপিস বসে গেলে পাথরে পাঁচ কিল। কি বলিস রে নীলমণি? ভুজনপুরের তখন তো মুখ ঢেকে বেড়াতে হবে দুধসরের কাছে।

নিরঞ্জনের অতএব আহার-নিদ্রা নেই। কাকে ধরলে কি হয়, সর্বক্ষণ সেই তদ্বির। পোস্টাপিসের প্রয়োজন জানিয়ে দরখাস্ত লেখা হয়েছে—দুধসর এবং আরও গোটা পাঁচেক গ্রাম ঘুরে ঘুরে শ'আড়াই সই যোগাড় করল। বাঁ-হাতে রকমারি কায়দায় লিখে সই আরও শ'তিনেক বাড়ানো গেল। দরখাস্ত চলে গেল উপরে। আশা পাওয়া গেছে জুলাই থেকে দুধসরে পোস্টাপিস। গোড়াতেই পাকা পোস্টাপিস নয়—এক্সপেরিমেন্টাল পোস্টাপিস, অস্থায়ী জিনিস।

এই বারে সকলের বড় বিপদ। টাকা জমা দিতে হবে সরকারে। দশটাকা বিশটাকা নয়, দস্তুরমতো মোটা অঙ্ক। সাধারণের দরখাস্তের উপর পোস্টাপিস বসানো—যদি দেখা যায় লোকসান হচ্ছে, পোস্টাপিস তুলে দিয়ে জমা টাকা থেকে খরচখরচা কেটে নেবে। চালু হয়ে গেল তো সম্পূর্ণ টাকা ফেরত পাবে কোন

একদিন।

গাঁয়ের লোকে কী আর দিতে পারে! দুধসরের গৌরব-স্থলেরা সব বাইরে। নিরঞ্জন অতএব গায়ে জামা পায়ে জুতো হাতে ছাতা এবং মনিব্যাগে আপাতত কলকাতার ট্রেনভাড়া সম্বল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

কলকাতায় বেণুধরের মেসে সর্বাগ্রে। কাঞ্চনের বড়ভাই বেণু। মামার বাসায় উঠবার আগে শৈশবে দুধসরে থাকত, তখন নিরঞ্জনের সেরা সাগরেদ ছিল সে। বেণুধরের চেয়ে বেশি জোরের জায়গা আর কোথা?

সন্ধ্যাবেলা। অফিস থেকে ফিরে বেণু নিচের তলার স্যাঁতসেঁতে আধ-অন্ধকার ঘরে সিটের উপর বসে তেলমুড়ি খাচ্ছিল। নিরঞ্জনকে দেখে কলরব করে ওঠে: কী কাণ্ড, তুমি যে বড় কলকাতায়! গ্রাম ছেড়ে চলে এলে—কলকাতা শহরের ভাগ্য।

ভৃত্যের উদ্দেশে হাঁক পাড়ছে: আমার দাদা এসেছে, কাটলেট কচুরি আর রসগোল্লা নিয়ে আয়। ছুটে চলে যা। আর কি আনবে বলে দাও নিরঞ্জনদা।

নিরঞ্জন খিঁচিয়ে ওঠে, আমি যেন মঙ্গলগ্রহের দেশ থেকে এলাম। বসতে বললি নে, কেমন আছ ভাল আছি সে সব কিছু নয়, পথের উপর থেকেই কাটলেট—

বেণুও সমান তেজে বলে, তুমি যেন বাইরের মানুষ পাদ্যঅর্ঘ্য দিয়ে বসতে বলব! কেমন আছ, সে তো চোখেই দেখতে পাচ্ছি। আমি ভাল আছি, সে-ও দেখছ। অন্য সকলের কথা—আজকেই কাঞ্চনের চিঠি পেলাম, তোমার কাছে আলাদা করে কি শুনতে যাব?

বাইরের মানুষ না-ই যদি ভাববি, কাটলেট-কচুরির হুকুম কেন দিলি রে হতভাগা? তেল-মুড়ি আমার যেন মুখে ওঠে না। কী

ঠাউরেছিস— মুড়ি না কাটলেট—কোনটা খেয়ে থাকি আমি? আসুক না তোদের চাকর, সঙ্গে সঙ্গে ছুঁড়ে ফেলব।

বেণু হেসে উঠল: ভাল হবে, আদাড়ে-আস্তাকুঁড়ে ফেলো না, ঘরের মধ্যে ফেলো। আমি খেয়ে নেবো। মুড়ি খেয়ে খেয়ে অরুচি ধরে গেছে, ভাল জিনিসে লোভ হয়। কিন্তু বিবেক বাগড়া দিয়ে পড়ে: ওরে বেণুধর, তোর বুড়ো বাপের এত কষ্ট, সোমত্ত বোনটার আজও বিয়ে দিতে পারলিনে, তুই এখানে কাটলেট ওড়াচ্ছিস? আজকে ওজুহাত আছে: দাদার জন্যে এনেছিলাম, না খেলে কি করব? পয়সার জিনিস ফেলে তো দেওয়া যায় না।

পরক্ষণে বলে, কাজের কথা হোক নিরঞ্জনদা, বিনি কাজে গ্রাম ছেড়ে আসার মানুষ তুমি নও। বলো।

নড়েচড়ে চৌপায়ার উপর বেণু ভাল হয়ে বসল। কান পেতে রয়েছে।

নিরঞ্জন বলে, পোস্টাপিস হবে।

কাঞ্চনও সেই রকম লিখছে। পিওনমশায় রিটায়ার করে চিঠির খুব গোলমাল হচ্ছে নাকি। কাঞ্চনের অনেক চিঠি মারা গেছে।

নিরঞ্জন রাগ করে বলে, চুলোয় যাকগে চিঠি। চিঠির জন্যে পোস্টাপিস নাকি? তোর বোন চিঠি পেল না পেল, বয়ে গেছে আমার। না পেলে বরঞ্চ ভালো। শাসন করে দিস, মেয়েমানুষে অত চিঠি লিখবে কেন—রকমারি চিঠি আসবেই বা কেন তার নামে?

একটু চুপ করে থেকে নিরঞ্জন রাগ সামলে নেয়। তারপর অন্য সুরে কথা: এই একটা ব্যাপারে সুজনপুরের কাছে হেঁটমাথা হয়ে ছিলাম, এদ্দিনে সুরাহা হচ্ছে। সাব-জজ আছেন, রায়সাহেব আছেন, ইঞ্জিনিয়ার আছেন—পোস্টাপিস তো লস্যি আমাদের পক্ষে। তাঁদেরই কাছে যাব বলে বেরিয়েছি।

বেণুধর বলে, চাঁদা?

চাঁদা তো বটেই, আর আছে চিঠি লেখার ব্যাপার। সেই জিনিসটা

ভাল করে তালিম দিয়ে আসব। গাঁ থেকে আমাদের যত লিখতে হয়, সে আমরা লিখে যাব। কিন্তু বাইরে থেকে ওঁরা যদি হেলা করেন, পোস্টাপিস কিছুতে রাখা যাবে না। বছরে হু'বার মোটে। কেন পাবেন না? ঠিক সময়ে খেয়াল করিয়ে দেব আমি।

ধাঁধাঁর মতো শোনাচ্ছে। বাইরে থেকে যারা লিখবে, বেণুধরও তাদের একজন। তাকেও অতএব বুঝিয়ে দিতে হয়। এমনি চিঠি লেখো না লেখো যায় আসে না। না লেখাও বরঞ্চ ভালো। সেই পয়সায় গণতির সময়ে বেশি করে লিখবে। হেড-অফিস থেকে দশ দিন করে চিঠি গণতি করে—বছরে হু'বার। গড় হিসাব করে তাই থেকে পোস্টাপিসের আয় নির্ণয় হয়। সেই ক'টা দিন গাঁয়ের মানুষ চাঁদা তুলে এর নামে ওর নামে চিঠি ছাড়বে। তেমনি আবার বাইরের নানা স্থান থেকে চিঠি এসে পৌছানোর দরকার। যেখানে যাবে নিরঞ্জন এই জিনিসটার তালিম দিয়ে আসবে। বেণুধরকেও লিখতে হবে—রোজ অন্তত খান আষ্টেক।

কথার মাঝে বেণু বলে ওঠে, চাঁদার কথাটা বলছ না যে আমায়?

আহত স্বরে আবার বলে, আমি সাব-জজ নই, ইঞ্জিনিয়ারও নই, পাঁচকে এক কেরানি। আমার চাঁদা তাই বুঝি বাদ?

নিরঞ্জন বলে, বলা কি ফুরিয়ে গেল রে? দুধসরের মাছিটা অবধি চাঁদা দেবে। কেউ বাদ নেই।

হাত বাড়িয়ে বলল, দিয়ে দে। তোর থেকেই চাঁদার বউনি হোক।

পুলকিত বেণু তাড়াতাড়ি বাক্স খুলে একখানা দশটাকার নোট নিরঞ্জনের হাতে দিল।

নিরঞ্জন গর্জন করে ওঠে: দেখ, চাল দেখাতে আসবিনে। মাইনে যা পাস আমার জানা আছে।

বেণু জবাব দেয়, মাইনে কম, খরচা যে আরও কম। কাঞ্চনের কলেজের মাইনে দিতে হত, উল্টে সে-ই এখন রোজগার করে বাবাকে

দিচ্ছে। বাবার হাতখরচা একমাস দু'মাস না পাঠাতে পারলেও বিনা আফিঙে তিনি থাকবেন না।

তাই বলে দশ? দশটাকা চাঁদার খুগি্য মানুষ তুই?

এবারে বেণুধর রেগে গেছে। ফস করে নোট ছিনিয়ে নিয়ে বাক্স খুলছে রেখে দেবার জন্য। বলে, অত কথায় কি! আমি সামান্য মানুষ—গ্রাম আমার নয়, পোস্টাপিসও নয়। আমি কেউ নই তোমাদের। পয়সাও দিচ্ছি নে, হল তো?

অভিমানে বেণুর গলা থমথম করে। নিরঞ্জন নরম হয়ে বলে, যাকগে, আধাআধিতে রফা হয়ে যাক—পাঁচটাকা। দাদা হই আমি তোর—বলি আমার একটা খাতির রাখবিনে?

ব্যথিত কণ্ঠে নিরঞ্জন আবার বলে, মেসে ফিরে বিকালে তেল-মুড়ি খেতিস, তা-ও বন্ধ হয়ে যাবে। যাকগে, শুনবিনে যখন কিছুতে—

বেণু হেসে বলে, তার জন্যে ভাবনা নেই, মুড়িওয়ালী ধার দেয়। দাম দু-মাস পরে দিলেও কিছু বলবে না। কিন্তু তুমি যে লম্বা পাড়ির মতলব নিয়ে বেরিয়েছ, যাচ্ছ সাবজজ-সাহেব অবধি···

নিরঞ্জনের পকেটে হাত ঢুকিয়ে মনিব্যাগ বের করে ফেলে। নিরঞ্জন হাঁ-হাঁ করে ঃ করিস কি, আমার ব্যাগে তোর কি গরজ?

ব্যাগ খুলে ততক্ষণে বেণু উপুড় করে ফেলেছে। একটাকা আর গোটা কতক পয়সা। বেণু হেসে বলে, কী রাজভাণ্ডার নিয়ে বেরিয়েছ, সে তো অজানা নেই আমার। টাকা দেবো না তো কি পায়ে হেঁটে যাবে সাবজজ-সাহেবের জলপাইগুড়ি অবধি?

দুধসর গ্রামের গৌরব সাবজজ-সাহেবের বাসাবাড়ি। গেলেই দেখা হয় না এসব মানুষের সঙ্গে, স্লিপে নামধাম ও প্রয়োজন লিখে পাঠিয়ে অপেক্ষা করতে হয়। দুধসর নামটা নিরঞ্জন খুব বড় করে লিখল। আরদালিকে বলে, নিয়ে যাও তো দেখি। এতেই হবে। গাঁয়ের নাম ধরে বছরের পর বছর বিজয়ার প্রণাম পাঠিয়ে আসছি।

মনের চাঞ্চল্যে বসতে পারে না। ঘণ্টা দুই পরে ট্রেন, সেই ট্রেনে ফিরবে। অনেক কাজ, ফিরতি-পথে তিন-চার জায়গায় নামবে। সাহেবগঞ্জে তো নিশ্চয়ই। রেলের কোয়ার্টারে থাকে তিন তিনজন—সামান্য লোক তারা, তবু গ্রামবাসী তো বটে! কেউ বাদ না পড়ে যায়। বাদ হলে দুঃখ করবে পরে কোনদিন যখন দেখা হবে। ওই বেণুধরের মতো।

আরদালি বেরিয়ে এলে নিরঞ্জন বলে, কি হল?

সাহেব কাজে ব্যস্ত। স্লিপ রেখে এসেছি, দেরি হবে। আপনি বসুন।

বয়ে গেছে নিরঞ্জনের বসতে। দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে গেল। চোখ তুলে সাবজজ-সাহেব উষ্ণকণ্ঠে বলেন, কি চাও।

পোস্টাপিসের চাঁদা। দুধসর থেকে আসছি। কী আশ্চর্য, আমায় না-ই বা চিনলেন, নিজের গ্রাম তো চিনবেন।

প্রণাম করবে, কিন্তু টেবিল ও সেলফের ব্যূহ ভেদ করে সাহেব অবধি পৌঁছানো বড় শক্ত। ফলাও করে পরিচয় দিচ্ছে: আমি নিরঞ্জন। কি বিজয়া দশমীর পরে বরাবর চিঠি পেয়ে আসছেন, সেই মানুষটা আমি। আপনাকে নিয়ে দুধসর গাঁয়ের কত দেমাক। গাঁয়ের গরজে আজ নিজে হাজির দিয়েছি।

বক বক করে নিরঞ্জন বলে চলেছে। সাবজজ ঘাড় গুঁজে পাতার পর পাতা লিখে চলেছেন—খুব সম্ভব এজলাসের কোন মামলার রায়। নিরঞ্জনের কথা দুটো হয়তো কানে যায়, পাঁচটা যায় না। নিঃশব্দ শ্রোতা পেয়ে নিরঞ্জনের ভারি স্ফূর্তি, মন খুলে বলে যাচ্ছে। সাবজজ ইঞ্জিনিয়ার রায়সাহেব এমনি সব ভারিক্কি বাসিন্দা দুধসর গাঁয়ের, দুধসরের সঙ্গে সুজনপুর পারবে কেমন করে? শেষ মারটা হচ্ছে এইবারে—এই পোস্টাপিসের প্রতিষ্ঠা।

আরও খানিক পরে চেয়ার ছেড়ে উঠে সাবজজ-সাহেব ভিতরে চললেন।

নিরঞ্জন বলে, টাকাটা তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিনগে। বসে রইলাম। দুপুরের গাড়িতেই রওনা হব। অনেক জায়গায় যেতে হবে তো—যাঁর কাছে না যাব, তিনিই চটে যাবেন। দেখেছ, আমায় হেলা করল, আমি যেন গ্রামের কেউ নই।

সাবজজ-সাহেব কিন্তু দুধসর গ্রাম কিছুতে মনে করতে পারছেন না। মা বেঁচে আছেন, একেবারে থুনথুনে-বুড়ি। তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, পল্লীগ্রামে কবে নাকি আমাদের বাড়ি ছিল, তুমি কিছু বলতে পার মা? গিয়েছ সেখানে? সেই ধাপধাড়া জায়গা থেকে চাঁদার জন্য চলে এসেছে—বোঝ একবার। বারোয়ারি পুজোর চাঁদা, থিয়েটারের চাঁদা, দরিদ্রভাণ্ডারের চাঁদা—এলে চাইতে বলতাম, পোস্টাপিসের চাঁদা কখনো তো শুনিনি।

মা উদার ভাবে বললেন, পিথিমি-জোড়া নাম করে ফেলেছ বাবা, নাম শুনে এত দূরে এসে পড়ল। দাও কিছু, যখন এসে ধরেছে। না হয় অপাত্রেই যাবে। দুধসরে আমিও কখনো যাইনি, আমার শাশুড়ি বলতেন শুনেছি। তোমার পিতৃপুরুষের গাঁ থেকে এসেছে, অত শত বিচার না-ই করলে। দিয়ে দাও দুটো টাকা।

সাবজজ-সাহেব মায়ের কথায় আবার গিয়ে নিরঞ্জনকে দর্শন দিলেন। পৃথিবী-জোড়া নাম হয়ে বিপদ হয়েছে—দুটো টাকা হাতে করে দিতে শরমে বাধল। পাঁচ টাকার নোট দিয়ে দিলেন একটা। সে-কথা বললেনও তিনি খুলে: মা দু-টাকা দিতে বললেন, কিন্তু গাড়িভাড়া করে তুমি অত দূরের জায়গা থেকে এসেছ—

কাজ করতে বেরিয়ে নিরঞ্জনের কিছুতে রাগ হয় না। সকৌতুকে বলে, সেই গাড়িভাড়াটা কত বলুন তো—

সাবজজ বলেন, আমরা ফার্স্ট ক্লাসে যাই, তোমাদের ক্লাসের ভাড়া কেমন করে বলি।

তর্কাতর্কি না করে টাকা পাঁচটা মনিব্যাগে ভরে নিরঞ্জন উঠে পড়ল।

এর পর কলকাতা ফিরে বেণুধরের মেসে এই প্রসঙ্গ উঠেছিল। বেণু বলল, টাকা মুখের উপর ছুঁড়ে বেরিয়ে এলে না কেন নিরঞ্জনদা।

নিরঞ্জন বলে, তাঁর কিছু লোকসান ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে খুঁটে নিয়ে তুলেপেড়ে রাখতেন। মুশকিল আমারই হত—বিনা-টিকিটে গাড়ি চেপে পথের মাঝখানে হয়তো নামিয়ে দিত। সাহেবগঞ্জে পৌঁছতেই কত দিন লেগে যেত ঠিকঠিকানা নেই। জমাটের গোড়ায় পোস্টাপিস বসান, এদিকে সাব্যস্ত করে বেরিয়েছি।

॥ ছয় ॥

সাবজজ-ইঞ্জিনিয়ার-কানুনগো এবং কেরানি-মাস্টার-মোটর ড্রাইভার—চাঁদার জন্য বড়-ছোট বিস্তর জায়গায় ঘোরাঘুরি করে নিরঞ্জনের এবার বুঝি খানিকটা দিব্যজ্ঞান লাভ হয়েছে। বেণুধরের মেসে দু-দুটো দিন ধকল সামলাতে গেল। তিন সিটের ঘর—শনিবার বলে অপর দুই মেম্বার অফিস অন্তে সরাসরি দেশের বাড়ি চলে গেছে। পাশা-পাশি দুই চৌপায়ায় দুজনা। খেয়েদেয়ে দরজায় খিল দিয়েছে।

এত বকবক করে বেণু, সন্ধ্যা থেকে আজ কথাবার্তা যেন গুনে গুনে বলছে। যে ক'টি কথা নিতান্ত নইলে নয়।

নিরঞ্জন বলে, হল কি তোর?

ধরেছ ঠিক নিরঞ্জনদা। মন বড় খারাপ। বাবা গালমন্দ করে চিঠি দিয়েছেন। চিঠি যখনই দেন, তার মধ্যে গালি। আজ একেবারে যাচ্ছেতাই করে লিখেছেন।

নিরঞ্জন অবাক হয়ে বলে, তোর মতন ছেলে হাজারে একটা হয় না। কোন ছুতোয় তোকে গালি দেন শুনি।

কাঞ্চনের বিয়ের কিছু করতে পারছিনে।

একটু থেমে আহত স্বরে বেণু বলতে লাগল, কী আমার রোজগার, বাবার কিছু অজানা নেই। মেয়ের বিয়ের মবলগ খরচ, অত টাকা পাই কোথা আমি।

পেলেও দিবিনে বিয়ে। নিরঞ্জন সন্ত্রস্ত হয়ে বলে, বিয়ে দিসনে—খবরদার, খবরদার। গাঁয়ের ঐ এক শিক্ষিত মেয়ে—আমাদের শিবরাত্রির সলতে। বিয়ে হয়ে ড্যাংড্যাং করে বরের ঘরে যাবে। এত কষ্টের বালিকা বিদ্যালয় উঠে যাবে মাস্টার বিহনে।

তাই বলে বোন আমার চিরকাল বুঝি ধিঙ্গি হয়ে বেড়াবে!

আলবৎ। দুধসরের খাতিরে। শিক্ষিত মেয়ে আর একটা

হাসব না।

রাগ করতেও পারবে না। কথা দাও।

আচ্ছা, রাগ করব না।

কাঞ্চনকে তুমিই বিয়ে করো নিরঞ্জনদা—

নিরঞ্জন চোখ পাকিয়ে পড়ে: তোকে ধরে ঠেঙাবো। হাসি নয়, রাগও নয়—এর ওষুধ ঠেঙানি দেওয়া।

বেণুও সমান তেজে বলে, অন্যায় কিছু বলিনি। বয়স হয়েছে বিয়ে কেন করবে না শুনি? কাঞ্চনের বড় ভাই হিসাবে আমি মত দিয়ে দিচ্ছি। আর বাবার হয়েছে—অরক্ষণীয়া মেয়ে কাঁধ থেকে নেমে গেলেই হল। গাঁয়ের মধ্যে চোখের উপরে থাকতে পারবে, বিষয়-সম্পত্তিও আছে দেখে যাব। বাবার অমত হবে না।

নিরঞ্জন হেসে বলে, আর কাঞ্চন? তার মত নিতে পারিনে। আদায় কাঁচকলায় আমরা। বাড়ির উপরে পেয়ে ফোঁস করে একদিন ছোবল মারতে এসেছিল।

বেণুধর নিশ্চিন্ত কণ্ঠে বলে, কাঞ্চন যাতে রাজী হয়ে যায়, তার ব্যবস্থা আমি করব। সে আমার অবুঝ বোন নয়।

নিরঞ্জন রাগ করে বলে, আমি রাজী নই—

কেন, বোন আমার খারাপ? চোখের উপর এদ্দিন ধরে দেখছ, কি দোষ পেয়েছ বলো। বলতে হবে।

নিরঞ্জন আমতা আমতা করে বলে চোখে কিছু ধরতে পারিনি, কিন্তু মারাত্মক দোষ আছে ঠিক—নয়তো তোদের বিষনজর কেন এত? নয়তো গলায় পাথর বেঁধে ডুবিয়ে মারবার ষড়যন্ত্র কিসের? কাঞ্চনের পাশে আমি বর হয়ে দাঁড়াব, গলায় পাথর বেঁধে গাঙে ছুঁড়ে দেওয়া তার চেয়ে অনেক ভাল।

বেণু কানেই নেয় না। বিনয় বশে লোকে নিজেকে ছোট করে বলে, নিরঞ্জনের কথা যেন তাই। আগের ধুয়োই বলে যাচ্ছে, বিয়ে হলে তোমার বালিকা-বিদ্যালয় নিয়েও চিরকালের মতো নিশ্চিন্ত।

মাইনে দাও আর না দাও, মাস্টারনী হাতছাড়া হবার উপায় রইল না।

নিরঞ্জন বলে, আমার সঙ্গেই যদি বিয়ে দিবি, বোনকে লেখাপড়া শিখতে দিলি কেন রে হতভাগা? ঐ মেয়ে বিয়ে করতে হলে ওর উপর দিয়ে যেতে হবে। দুটো পাশ করে বসে আছে—ওর যে বর হবে, তিনটে পাশ চাই অন্তত তার।

হেসে উঠে বলে, আজ থেকেই যদি লেগে যাই, তিন পাশে পৌঁছুতে এ জন্মে কুলাবে না। তোর বোনাই হবার কোন উপায় নেই। তার চেয়ে তুই বরঞ্চ একটা পাশ-করা মেয়ে বিয়ে করে ফেল বেণু! ইস্কুলের উপকার হবে।

বেণু হেসে বলে, বলেছ ভা সেয়ানা বোনের বিয়ে হচ্ছে না, নিজের বিয়ের পুলক—ক্ষেপে গিয়েছি বলবে লোকে। তখন আর চিঠির উপরে নয়—লাঠি হাতে বাবা আমার মেস অবধি তেড়ে আসবেন।

নিরঞ্জন সেই এক সুরে বলে যাচ্ছে, দুটো পাশ না-ই হল, একটা পাশওয়ালা দেখে বিয়ে করে ফেল তুই। বিয়ে করে তুধসর পাঠাবি —সঙ্গে সঙ্গে বালিকা-বিদ্যালয়ের চাকরি। বিয়ে হয়ে কাঞ্চন তখন হিল্লিদিল্লি যেখানে খুশি চলে যাক, তাকিয়েও দেখব না। তাকে আর গরজ কি তখন?

সকৌতুকে বেণুধর বলে, তোমাদের গরজ না থাকল হিল্লিদিল্লি নিয়ে যাবার মানুষটা পাই কোথা? কে বিয়ে করছে?

আছে কত মানুষ! জলে পড়তে চায়, আগুনে পুড়তে চায়। এই কলকাতা শহরেই কত পড়ে আছে, খোঁজ নিয়ে দেখিস। পোস্টাপিস ভালোয় ভালোয় হয়ে যাক, প্রমাণ সহ তখন আমিই খোঁজ দিতে পারব।

চকিতে একটু ভেবে নিয়ে নিরঞ্জন আবার বলে, মাইনর-ইস্কুলের হেডমাস্টারমশায় কাজ ছেড়ে দেবেন বলছেন। বয়স হয়েছে, পেরে ওঠেন না। উপযুক্ত হেডমাস্টার কেউ এসে কাঞ্চনাকে বিয়ে

করুক না। বিয়ে করে সে মানুষ দুধসরে থাকবে। মাইনর-ইস্কুল বালিকা-বিদ্যালয় দুটো ব্যাপারেই নিশ্চিন্ত তখন।

ঐ মতলব এখন মাথায় পাক দিচ্ছে। বলে, বাণীশঙ্করী লেন কোথায় কতদূরে ভাল করে বুঝিয়ে দে দিকি আমায়।

[illegible] পেরিয়ে [illegible]। খুঁজে খুঁজে নিরঞ্জন বাণীশঙ্করী লেনে সমর গুহর বাড়ি বের করল। চাকরে দেখিয়ে দেয়: ঐ যে দাদাবাবু।

ইনিয়ে বিনিয়ে এই ছোকরা বাপধনকে প্রেমের চিঠি লেখে। হোক তবে প্রেমের পরীক্ষা।

চা ও সিগারেট সহ গুলতানি হচ্ছে সমবয়সি পাঁচ-ছজন মিলে। অকুতোভয়ে নিরঞ্জন তাদের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

বিরক্ত দৃষ্টি তুলে সমর বলে, কাকে চাই আপনার?

আপনাকেই। উঠে আসুন, আড়ালে বলব।

সমর বাইরে এলো। কি?

একগাল হেসে নিরঞ্জন বলে, চাকরির খবর নিয়ে এসেছি। করবেন?

সমর বলে, চাকরির জন্য আমি উন্মুখ হয়ে আছি, এ খবর আপনাকে কে দিয়েছে?

নিরঞ্জন সেকথার জবাব না দিয়ে বলে, দুধসর এম-ই ইস্কুলে হেডমাস্টারি।

আচ্ছা মানুষ তো মশাই। উপকার না করে কিছুতেই ছাড়বেন না? ইস্কুল-মাস্টারি আমি করব না।

কিছু থাবড়ে গিয়ে নিরঞ্জন বলে, ভাল করে কানে নিলেন না বোধহয়। জায়গাটা হল দুধসর।

দুধসর হোক আর দইক্ষীর হোক, কলকাতা ছেড়ে এক-পা আমি কোথাও যাচ্ছিনে। লাট সাহেবের চাকরি হলেও না।

তিতবিরক্ত হয়ে নিরঞ্জন ফিরল। শহুরে প্রেমের এই নমুনা।

বিরক্ত হলে ঝাঁপ দিয়ে মরবে, কিন্তু সেটা কলকাতার গঙ্গায়। শহরের সীমানার বাইরে অন্য কোন জায়গা হলে হবে না।

আরও ক'দিন এখানে সেখানে ঘুরে নিরঞ্জন দুধসর ফিরে এল আবার। চাঁদা যা উঠেছে, ট্রেনভাড়াতেই খেয়ে গেল। হাত প্রায় শূন্য।

নীলমণি শুকনোমুখে বলল, টাকা জমা দেবার তারিখও তো এসে যাচ্ছে। উপায়?

উপায় সান্তুদি। ক'দিন ধরেই ভাবছি। বাইরের মানুষ বিস্তর নেড়েচেড়ে দেখে এলাম। গাঁয়ের মানুষের দ্বারা কিছু ইতরবিশেষ হবে না। মানুষ সই দিয়েও দেবার লোক পাশাপাশি চাই যাদের। পয়সা চাই, তা যা, সেই শব্দই এখন আর কানে শুনতে পারে না। যত ভাবছি, সান্তুদি ছাড়া অন্য কাউকে মনে পড়ে না।

নীলমণি বলে, দুটাকা পাঁচটাকার তেজারতি সান্তুদির। অত টাকা দিতে যাচ্ছেন উনি! পাবেনই বা কোথা?

দেবেন কি আর উনি? আমাদের দরকার পেতে হবে কায়দা-কানুন করে।

সেই কায়দাকানুনের আন্দাজ পেয়ে নীলমণি শিউরে উঠল — কী সর্বনাশ!

নিরঞ্জন বলে, সকালে স্বদেশি ছেলেরাও এই পথ নিয়েছিল। বোমা-বিভলভারের দাম যোগাড় হত ডাকাতি করে। লোকে ভাল মনে ইচ্ছে করে না, দলে উপায়টা কি? আমরা সামান্য লোক, ছোটখাট কাজ—স্বদেশ বলতে এই দুধসর আমাদের। আমাদের ডাকাতি নয়, চুরিতেই হয়ে যাবে।

নীলমণি সকাতরে বলে, বিধবা-বেওয়া মানুষ—তোমার জন্যে কী না করেন উনি। ওঁকে রেহাই দাও।

চটে গিয়ে নিরঞ্জন বলে, কূলে এসে ভরাডুবি হোক, সেইটে চাস

তুই ; রেহাই দেবো বলেই তো দেশদেশান্তরে বেরিয়েছিলাম। বড় বড় মানুষ দেখে এলাম—বড়র নাম নিয়ে ঢাক বাজাতেই ভাল। কাজে আসে না, তারা কেবল কথার সরবরাহ দেয়।

পরক্ষণে সান্ত্বনা দেয় নীলমণিকে : সানুদির টাকা মারা যাবে না, পোস্টাপিস চালু হলেই জমা টাকা ফেরত দিয়ে দেবে। আর চালু না হয়ে যাবে কোথা ? কোন দিন আমরা হেরেছি, বল নীলমণি ?

নীলমণিও জোর দিয়ে বলে, চালু হবেই। একখানি এগিয়ে এসে পোস্টাপিস যদি না হয়, গুজনপুরের লোক তিষ্ঠাতে দেবে না আমাদের —ঠাট্টা তামাশায় অস্থির করবে। হতেই হবে চালু।

সানুদি অনেক কাল থেকে নিরঞ্জনের সংসারে। বিধবা হয়ে শ্বশুরবাড়ি টিকতে পারছিলেন না। নিরঞ্জনের মা তখন আশ্রয় দিলেন। আত্মীয় সম্পর্ক আছে কি না আছে, কিন্তু মেয়ে বলে পরিচয় দিতেন তিনি সকলের কাছে। মা চলে যাওয়ার পর সানুদি সংসারের সর্বময়ী এখন। কুটোগাছটি ভাঙে না নিরঞ্জন, দশ-কাজে সময় কখন তার ? সানুদি না থাকলে এতদিন ভেসে যেত কোথায়। আঁচলে চাবি বেঁধে ঘরে-বাইরে তিনি অহরহ চোখ ঘুরিয়ে বেড়ান। বর্গাদার ধান মেপে দেবার সময় চিটা মিশিয়েছে, তার জন্য ঝগড়া করছেন। আবার এদিকে নিরঞ্জনের কয়েকটা ঠেঁচকি উঠেছে— একটা ছোঁড়াকে গাছে তুলে কচি-ডাব পাড়াচ্ছেন তার জন্য।

এই মানুষ সানুদি। মানুষের দুটো চোখ থাকে, সানুদির বোধ-করি পিছন দিকেও আর দুটো চোখ। সেই চোখের উপর দিয়ে বিধবার সম্বল হেলেহার ছড়া গাপ করে নিরঞ্জন ভোরবেলা নীলমণিকে এসে ডাকছে : গঞ্জে চল যাই।

উঠে চোখ মুছতে মুছতে নীলমণি বলে, এত সকালে গঞ্জে কেন ?

টাকার যোগাড়ে যেতে হবে না ? পোদ্দারের কাছে কর্জ করব। জমা দেবার শেষ তারিখ আর তিনটে দিন পরে। খেয়াল আছে ?

গভীর রাত্রে। নিরঞ্জন চুপিসারে দাওয়ায় উঠেছে, নীলমণি উঠানের একদিকে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে গতিক বুঝে নিচ্ছে।

দরজায় ঘা দিতে হল না. পায়ের শব্দেই সান্তুদি রে-রে করে উঠলেন: কে রে, কে তুই?

এই রাত্রি অবধি জেগে বসে আছেন নিরঞ্জনের অপেক্ষায়। খিল খুলে বেরিয়ে হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলেন: তোরই কাজ—তুই ছাড়া অন্য কেউ নয়। ঘরের শত্রু ছাড়া কেউ এমন পারে না। মায়া নেই, দয়াধর্ম নেই।

নিরঞ্জন তাড়া দিয়ে ওঠে: হয়েছে কি বলবে তো সেটা—

সান্তুদি বলেন, ক্যাসবাক্স ভেঙে আমার হার বের করে নিয়েছিস। নিয়ে গুষ্টির শ্রাদ্ধ করতে সাত সকালে বেরিয়ে পড়েছিলি।

নিশিরাত্রে চারিদিক নিঃসাড়। তার মধ্যে ডাক ছেড়ে কাঁদতে লাগলেন। পুত্রশোকেও এমন করে কাঁদে না লোকে: ওরে হতভাগা, হার না নিয়ে আমার মুণ্ডুটা ছিঁড়ে নিয়ে গেলিনে কেন।

মুণ্ডু বন্ধক রেখে কি টাকা দিত সান্তুদি।

হাসছে নিরঞ্জন। সান্তুদিকে ঠাণ্ডা করার মন্ত্র জানে সে সত্যি সত্যি। আস্কিলোর সুরে বলে, বন্ধক দিয়েছি তোমার জিনিস, বিক্রি করিনি। তাই নিয়ে কান্নাকাটির কি হল, বঝতে পারিনে। জিনিসটা পড়ে পড়ে জং ধরছে— বলি, পয়সা কিছু আসুক না রোজগারপত্তোর করে। তোমার ক্যাসবাক্সে ছিল, গিয়ে এখন পোদ্দারের আলমারিতে উঠল। পোদ্দার টাকা ধার দিল— তুমিও ধরে নাও ছেলেতার ধার দিয়েছ আমাদের। ধার আমি একলা নিইনি—পোস্টাপিস সর্ব-সাধারণের, গ্রামসুদ্ধ খাতক তোমার।

সন্তুদি একেবারে চুপ। গ্রামসুদ্ধ মানুষের উত্তমর্ণ হবার আত্ম-প্রসাদ উপভোগ করছেন বোধকরি মনে মনে। নিরঞ্জন আরও পুলকিত করে তাঁকে: পোদ্দার সুদ নেবে। তোমাকেও মাসে মাসে

সুদ দিয়ে যাবো যতদিন না গয়না ফেরত দিতে পারছি। নিয়ে নাও আগাম একমাসের সুদ! তেজারতি করছ কম দিন হল না—ক'টা খাতক আগাম সুদ দেয় শুনি?

ছুটো টাকা নখে বাজিয়ে টুং-টুং আওয়াজ তুলে নিরঞ্জন সান্নুদিকে দিয়ে দিল। চোখে যে অশ্রুচিহ্ন ছিল, আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে সান্নুদি আঁচলে মুছে ফেললেন। ভিন্ন সুরে বলেন ছু'টাকা সুদ বড্ড কম হয়ে যায়। ভারীসারি জিনিসটা আমার—চারটাকা। যাক গে যাক—সাধারণের কাজ—তার মধ্যে আমিও তো একজন। তিন টাকার কমে কিছুতে হবে না।

পোদ্দারের কাছ থেকে পরে আবার তিন টাকা চেয়ে নেওয়ার রহস্য এতক্ষণে বোঝা গেল। উঃ, কত বুদ্ধি ধরে নিরঞ্জন—ব্যাপারটা আন্দাজ কেমন মনে মনে ছকে রেখেছে।

এই এক স্বভাব—তেজারতির টাকা খাটাতে পারলে সান্নুদি আর কিছু চান না। সুদের লোভ দেখিয়ে কত লোকে যে তাঁকে ঠকিয়ে নিয়ে যায়—

ছু'টাকা কর্জ দাও সান্নুদি, দু-আনা সুদ মাসে মাসে।

ছু-আনা নয়, চার আনা। পয়লা মাসের সুদটা আগাম।

উঁহু, চার আনা হলে যে গলায় ছুরি দেওয়া হয়। তোমার কথা থাক, আমার কথাও থাক—তিন আনা কেটে নিয়ে এক টাকা তের আনা দাও আমায়।

সান্নুদির সুদের হার বড় চড়া। সুদ নিয়ে তর্কাতর্কি দর-কষাকষিও করতে হয়। খাতকে তবু ছাড়ে না। গণেগেঁথে ঐ যে এক টাকা তেরো আনা নিয়ে গেল, আর কখনো এ-বাড়ি পা দেবে না পারতপক্ষে। সান্নুদিরও সেজন্য মাথাব্যথা নেই। ঐ যে একবার আগাম সুদ পেয়ে গেছেন, তাই নিয়ে মশগুল।

দেখা হলে বিপদও আছে। খাতকের নয়, সান্নুদির।

রাগ করে সান্নুদি তেড়ে ওঠেন: সুদ-টুদ দিসনে, ভেবেছিস

কি তুই। আজকেই চাই আমি সুদ শোধ করে দিয়ে তবে যাবি।

খাতক বলে, কত?

এইখানে সান্নুদির মুশকিল। হিসাবপত্র মাথায় ঢোকে না। কিছু নরম হয়ে বললেন, সে আমার খাতায় লেখা রয়েছে। কিন্তু তুই আমার টাকা মেরে খেয়েছিস, তোর তো বেশি করে মনে থাকবে কত হয়েছে, তুই বল সেটা।

খাতক লোকটা অম্লান বদনে বলে, আট আনা।

আট আনা না আরো কিছু। বারো আনার এক পয়সা কম নয়।

লোকটা চটে উঠল। হিসাবে আমি কারচুপি করছি বলতে চাও? বেশ, তোমার খাতা তবে বের করে আনো সান্নুদি।

সান্নুদি বলেন, নাই বলে এত কম কিছুতে হতে পারে না। কত [illegible] হয়ে গেল। বারো আনা না হয় দিস, নেহাৎ পক্ষে দশ আনা তো দিবি। দিয়ে দে ভাই।

লোকটা অবশ্য নরম হয়ে বলে, দেবো কি গাছ থেকে পেড়ে? কর্জ দাও, তবে তো দেবো। তিনটে টাকা বের করো - সে টাকার আগাম সুদ যা হয়, আর পুরনো হিসাবের ঐ দশ আনা কেটে রেখে বাকি আমাকে দিয়ে দাও। উঃ, কাবুলিওয়ালা হার মানালে তুমি সান্নুদি।

সুদ আদায়ের খাতিরে সান্নুদিকে পুনশ্চ আবার কর্জ দিতে হয়। তাহলেও সুদটা পেয়ে গেছেন, এই বড় তৃপ্তি।

আজকেও সুদের বাবদ নগদ তিন সিকি টাকা পেয়ে সান্নুদির আনন্দের অবধি নেই। নিরঞ্জনকে বলেন, ভাত বাড়তে যাচ্ছি। হাত পা ধুবি তো শিগগির সেরে আয়। রাত কাবার হয়ে এলো।

উঠানের দিকে নজর পড়ল: ওটা কে রে নীলমণি বুঝি? ভূতের মতন অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কেন? আসতে বল ওটাকে, তা কি ওখানে দাঁড়িয়ে থাকবে?

॥ সাত ॥

গ্রাম তুধসর, পোস্টাপিস তুধসর, থানা জাঙ্গুলগাছি

পোস্টাপিস বসে গেল গ্রামে। অস্থায়ী অফিস এখন পাকা [illegible] পাকাঘর না তুলে দেও। হবে, এক বছর পরে বিবেচনা। ক'দিন [illegible] থাকতে হবে। নিরঞ্জনের আটচালা ঘরের একটা দাওয়া [illegible]শের বেড়ায় মজবুত করে ঘিরে দিল। অফিস সেখানে। রানার নীলমণি, পোস্টমাস্টার নিরঞ্জন। জিনিসটা পুরোপুরি মুঠোর মধ্যে। এখন এই ব্যবস্থা চলুক, পোস্টাপিস পাকা হয়ে গেলে তখন [illegible] করা যাবে। গ্রামের লোকেরও সেই মত। চার টাকা মাইনের পোস্টমাস্টার—চার টাকার জন্য কে অত ঝামেলা পোহাতে যাবে একমাত্র এই নিরঞ্জন ছাড়া?

[illegible] কয়েকটা দিন কী উত্তেজনা মেয়েপুরুষ সকলের! বাজের মতন কাজ দেখালে বটে নিরঞ্জন—তুধসর গ্রামে গভর্নমেন্টের খাস অফিস। বাংলা-গভর্নমেন্ট নয়—খোদ ভারত গভর্নমেন্ট, [illegible] শাসন। কত বড় ইজ্জত! গুজনপুরের দর্পচূর্ণ—তুধসরের উপর শেষ মাতব্বরিটুকুও খসে গেল।

রানার নীলমণি সিল-করা ডাকের ব্যাগ গুজনপুর সাব-অফিসে পৌঁছে দিয়ে গুজনপুরের ব্যাগ তুধসর নিয়ে আসে। নিরঞ্জন আপিসের ভিতরে স্থির হয়ে থাকতে পারে না। আসে না কেন এখনো নীলমণি—না-জানি কী সব জিনিস ব্যাগের ভিতরে বয়ে এনে আজ হাজির করবে! খামের চিঠি, পোস্টকার্ডের চিঠি, মনিঅর্ডার। হয়তো বা রেজিস্ট্রি-পার্শেল। সেই সব চিঠি-পার্শেলে কত কি রহস্য—আগে থাকতে কিছু বলবার জো নেই। উত্তেজনায় নিরঞ্জন পোস্টাপিসের আটচালা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। দুপুরের কড়া রৌদ্রে হাঁটতে হাঁটতে গ্রাম-সীমানায় মাঠের ধারে দাঁড়ায়, দূরের পথে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। রানারকে এগিয়ে নিয়ে আসবে।

অবশেষে এক সময় দেখতে পাওয়া গেল—মোড় ঘুরে নীলমণি দেখা দিয়েছে। ঘরব্যাভারি সে নীলমণি আর নেই—সরকারি চাকরে, নতুন সজ্জা তার এখন। বাদামি চামড়ার চাপরাসের মাঝখানে ঝকঝকে পিতলের পাতের উপর খোদাই-করা 'মেল-রানার' রোদের জন্য গায়ের চেক-কাটা চাদর মাথায় জড়িয়ে দিয়েছে—যেন রাজমুকুট। খাটো আছাড়ের বল্লম কাঁধে, বল্লমের গলায় ঘন্টি—অন্য পাশে ডাকের ব্যাগ। ভারত-গভর্নমেন্টের মেলরানার রাবমদে পা ফেলে মাটি কাঁপিয়ে দ্রুত চলে আসছে। ঘন্টি বাজছে ঠনঠন করে—পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াও সব—সামাল, সামাল।

হাঁপাতে হাঁপাতে এসে পোস্টাপিসের দরজার সামনে ব্যাগটা ছুঁড়ে দিয়ে নীলমণি রান্নাঘরের দিকে চলে যায়। জল দাও মাসিদি, বড্ড তেষ্টা পেয়ে গেছে।

পিওনমশায়ের আমলে এই জুলুসরে দেখা গেছে—কারো হাতে চিঠি গুঁজে দিলেন, মানুষটা গান করছে তো করছেই, চিঠিখানা উল্টে পাল্টে দেখারও আগ্রহ নেই। গাঁয়ের নিজস্ব পোস্টাপিস হওয়া অবধি বিষম উৎসাহ সেই সব মানুষের—দরজা ঘিরে ভিড় করে দাঁড়ায়। চিঠিপত্র যদি থাকে, হাতে হাতে নিয়ে নেবে। চার টাকা মাইনের পোস্টমাস্টার নিরঞ্জনকে পিওনের কাজটাও সেরে দিতে হবে অবসর মতো, অন্যথা পোস্টাপিসে আলাদা পিওনের খরচ দেওয়া হবে না। এবং পোস্টাপিসের প্রয়োজনে যাবতীয় বাজে খরচের দায়িত্বও তার উপরে—ঐ চার টাকা মাইনের ভিতর থেকে।

তাহলেও সরকারি চাকরি, সে মাহাত্ম্য যাবে কোথায়? মাটির মানুষ নীলমণি, চিরদিন আস্তে-আস্তে করে কথা বলে এসেছে, মেলব্যাগ ঘাড়ে তুললেই সঙ্গে সঙ্গে তার যেন দুনিয়া অগ্রাহ্য করা ভাব। নিরঞ্জনও তেমনি পোস্টাপিসের টুলের উপর বসলে ভিন্ন একজন হয়ে যায়।

শাঙন এসেছে এই ডাকের সময়টা। অন্যদিন বালিকা-

বিদ্যালয়ে থাকতে হয়, রবিবার বলেই আজ আসতে পেরেছে। সরে গিয়ে সকলে কাঞ্চনের জন্য দরজা খালি করে দিল। স্লিপারের আওয়াজ তুলে কাঞ্চন ঢুকে পড়তে যায় —কিন্তু সাধ্য কি পোস্টমাস্টার অফিসের মধ্যে হাজির থাকতে। নিরঞ্জন হুমকি দিয়ে ওঠে : নো, নো—নোটিশ সো পড়ে দেখবে আগে—

চৌকাঠের উপরে ইংরেজি ও বাংলায় লেখা সাইনবোর্ড : নো অ্যাডমিশন—ভিতরে আসিও না। আঙুল বাড়িয়ে নিরঞ্জন সরকারি আদেশ দেখিয়ে দেয়। খাতির-উপরোধ নেই এ ব্যাপারে। কাঞ্চন মুখ লাল করে থমকে দাঁড়ায়, তারপর ফরফর করে চলে গেল।

আপিসে না ঢোকা যাক, বাইরে দাঁড়াতে মানা নেই। ঢপাঢপ সিল পড়ে চিঠি উপর—এক দুই তিন চার বাইরে থেকে উৎসাহী দু তিন জনে গণে যাচ্ছে। আঠারো হয়ে গেল। দুধসর পোস্টাপিসে এত চিঠি—এত সব চিঠি লিখবার মানুষ কোথায় ছিল রে এদ্দিন ঘুমিয়ে?

চিঠিপত্র আসে, মনিঅর্ডারে টাকাকড়িও আসতে লেগেছে। ইংরেজি মাসের চার তারিখে বেণধরের টাকা আসে বাপ শৈলধরের নামে। ছুটিছাটা না থাকলে চার তারিখেই সুনিশ্চিত। পুরা দমে চলছে পোস্টাপিস। ঠুন ঠুন করে ঘন্টি বাজিয়ে চতুর্দিকে জানান দিয়ে মেলব্যাগ কাঁধে নীলমণি সগৌরবে ছোটে। শ্রীগঞ্জ গ্রাম পার হয়ে মাঠে পড়ল এবার। চাষীরা নিড়ানি দিচ্ছে। নীলমণির খাতির সর্বত্র—আগেও ছিল, সরকারি লোক হয়ে বেড়ে গেছে। ক্ষেত থেকে ডাকছে : এসো নীলমণি ভাই, তামাক খেয়ে যাও। আলের উপর মেলব্যাগ নামিয়ে পা ছড়িয়ে বসে হাতের মুঠোয় কলকে নিয়ে তাড়াতাড়ি দু'টান টেনে নিল নীলমণি। পথ-সংক্ষেপের জন্য এবারে মুচিপাড়ার পথ ধরে। দুর্ধর্ষ চোর-ডাকাত এই মুচিরা—সেই প্রসঙ্গ যদি কেউ তোলে নীলমণি চাপরাস দেখিয়ে দেয় : রাজার মাথার মুকুট আর

আমার কোমরের চাপরাসে তফাত এমন-কিছু নেই। দেখুক না বেটারা ছুঁয়ে। শুধু আমাদের জাঙলগাছি থানা নয়, কলকাতার লাট-সাহেবের বাড়ি অবধি টনক নড়ে যাবে।

চাপরাসের মহিমা মুখে মুখে মুচিদেরও কান অবধি পৌঁছে গেছে। টাকাকড়ির কত চলাচল ব্যাগের ভিতরে—সাহস করে চোখ তুলে কেউ তাকাবে না থানার নীলমণির দিকে।

চাষীপাড়ার ভুবন সর্দার একদিন এসে বলে, পোস্টাপিস কত করে?

পোস্টকার্ডে কথাবার্তা লিখে ডাকবাক্সে ছাড়লে কাঁহা-কাঁহা মুলুক চলে যায়, এ বিষয়ে সর্বশ্রেণীর মধ্যে জ্ঞানোদয় হয়েছে। তবে বলতে গিয়ে নামের হেরফের হয়ে যায়—পোস্টাপিস বলে বসে পোস্টকার্ডকে। দু-পয়সা দাম শুনে ভুবন বলে, আমি বাবু এক জোড়া নিচ্ছি, তিন পয়সার বেশি দেবো না কিন্তু—

নিরঞ্জন বুঝিয়ে বলে, ভারত গভর্নমেন্ট দর বেঁধে দিয়েছে -

ভুবন সর্দার বিশ্বাস করে না। বেজার হয়ে বলে, দিন না দর বেঁধে—তাই বলে একটা খাতির থাকবে না! একসঙ্গে দুখানার খদ্দের পাইকারি দরও তো থাকে সব জিনিসের।

নিরঞ্জন বলে, পোস্টকার্ডে কি লিখতে হবে, তাই বলো। আমি গুছিয়ে-গাছিয়ে লিখে দিচ্ছি। কিন্তু দামের কম বেশি করবার উপায় নেই ভুবন। আমি কোন ছার—খোদ লাটসাহেব হলেও পারবেন না।

আধঘণ্টা ধরে তর্কাতর্কি, ভুবন কিছুতে বুঝল না। অবশেষে বলে, তিন পয়সার বেশি নেই আমার কাছে। এক পয়সা বাকি থাকল তবে। যখন পারি, দিয়ে দেবো।

একা ভুবন নয়, অনেকের সঙ্গেই ব্যবস্থা এমনি। পাকাখাতা তৈরি করতে হয়েছে ধারবাকি লিখে রাখবার জন্য। চার টাকার পোস্টমাস্টারের বাড়তি কাজ চিঠি বিলি শুধু নয়, খাতা ধরে

হাটেঘাটে এইসব পাওনার তাগিদ করে বেণ্ডন দশটা বাজারে, না, ওয়াদা করে ঘোরায়। নিরঞ্জন এক এক সময় পড়ে : নাঃ, হালখাতা করব এবার পোস্টাপিসে। গণেশপুজোরা বাজনা-বাদ্যি হবে—ধারবাকি তখন যদি দিয়ে দেয়।

এ সমস্ত যা-হোক এক রকম চলে যাচ্ছে, মারাত্মক কিছু নয়। ফ্যাসাদ হয়েছে ইনস্পেক্টর নিয়ে। হরবখত তিনি আসতে লেগেছেন। হাজির থেকে শলাপরামর্শ দেবেন নতুন পোস্টাপিস চড়চড় করে যাতে জাঁকিয়ে ওঠে। খুঁটিয়ে কাজকর্ম দেখবেন নাকি। দেখেন তো কচু। এসেই নিরঞ্জনের আটচালা-ঘরে ঢুকে ধবধবে তোষক-চাদরের বিছানায় গড়িয়ে পড়বেন। এটা খাবো ওটা নেবো, নিরন্তর বায়না। রোদের জোর কমলে আসন্নসন্ধ্যায় বেরিয়ে পড়েন, দ্রুতপায়ে গ্রাম চক্কোর দিয়ে বেড়ান। হাটবার হলে হাটে যান কখনো-সখনো। দুপুরের সাংঘাতিক একপ্রস্থ আয়োজন নিঃশেষিত হবার পর সাদুদি এদিকে সান্ধ্য জলযোগের জন্য ক্ষীরের-ছাঁচ বানাতে বসে গেছেন। রান্নাঘর থেকে বেরুনোর ফুরসত হল না সারা দিনমানের মধ্যে। নীলমণি ওদিকে গ্রামে গ্রামে ঘুরে পাঁঠা এনে হাজির করল। ভ্যা-ভ্যা করছে উঠানের উপর, ডালসুদ্ধ কাঁঠালের পাতা এনে খেতে দিচ্ছে। রাত্রিবেলা পাঁঠার হাঙ্গামায় কাজ নেই, শুভ পদার্পণ যখন ঘটেছে ত্রিরাত্রি-বাস তো নির্ঘাৎ। পাঁঠার ঘাড়ে কাল সকালে কোপ পড়বে।

ভ্রমণ থেকে সন্ধ্যাবেলা হেলতে দুলতে ইনস্পেক্টর ফিরে এলেন। নিরঞ্জন মুকিয়ে ছিল। বলে, কী জিনিস নীলমণি জুটিয়ে এনেছে, একটি বার চোখে দেখে যান। কালো কুচকুচে, গায়ের উপরেই তেল পিছলে পড়ে যেন—ঠিক রাজপুত্তুর।

ইনস্পেক্টর উদাসীন। তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন, পাঁঠা বই তো নয়। নিরামিষ পাঁঠা খাইয়ে খাইয়ে অরুচি ধরিয়ে দিলেন মশায়।

আমার কোমরের আবার যখন আসব রামপাখির ব্যবস্থা রাখবেন বেটারা ছুঁয়ে।'

সাহেবের আবার আসবেন—সে কিছু অনিশ্চিত দূরভবিষ্যতের ব্যাপার নয়। এই যাচ্ছেন—আবার তো এলেন বলে। এ মাসের ভিতর না-ই হল তো পরের মাসে। এসে রামপাখি অর্থাৎ মোরগের সেবা নেবেন, ফরমাশ হয়ে রইল। বড় একটা মানকচু দেওয়া হল এবারে, না-না করতে করতে সাইকেলের পেছনে বেঁধে নিলেন। বললেন, হাটে নলেনগুড় উঠছে, চিনি ফেলে লোকে নাকি সেই গুড় খায়। কিনে রাখবেন তো এক ভাঁড়, দাম দিয়ে নিয়ে নেবো।

পোস্টাপিস বসানো চাট্টিখানি কথা নয়। এক মচ্ছব সারা হতে না হতে পরবর্তীর আয়োজনে লেগে যেতে হয়—ওরে নীলমণি, শুনলি তো সব নিজের কানে? লেগে যা। রামপাখি আর নলেন-গুড়।

নীলমণিও তিতবিরক্ত হয়ে উঠেছে। বেজার মুখে বলে, নলেনগুড় হাটে উঠছে, কোন চোখ দিয়ে উনি দেখলেন? ক্ষেতেলের ঘরেও নেই এখন, ফড়েরা কিনে চালান করেছে। কারো গুদোমে দু-এক ভাঁড় পড়ে থাকতে পারে। পিলে-চমকানো দর হাঁকবে। সে তো গুড় খাওয়া নয়, কড়মড় করে পয়সা চিবিয়ে খাওয়া।

পয়সাটা যে পরের, তাই চিনি ফেলে গুড় খেয়ে নেবে। মুখ ফুটে বলেছে, দিতেই হবে। ওর এক কলমের খোঁচায় পোস্টাপিসের মরণ-বাঁচন।

নীলমণি গজর-গজর করে: এই তো চলেছে একনাগাড়। এসেই মুখ ফুটে এক একখানা ছাড়বেন, আর আমি বেটা মুলুক চুঁড়ে মরি। ঐ যে মানকচু সাইকেলে তুলে নিলেন—গাঁয়ে মিলল না তো ন'পাড়ার হাটে গিয়ে মানকচু কিনতে হয়। আসতেও লেগেছেন চাঁদে চাঁদে। আরও কত পোস্টাপিস কত দিকে—যে সব জায়গায় ন-মাসে ছ-মাসে একবার যান। তোয়াজ নেই, কোন সুখে যাবেন?

গেলে তো হা-পিত্যেশ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে কখন দশটা বাজবে, পোস্টমাস্টার এসে চাবি খুলবেন।

নিরঞ্জন বলে, যাদের পাকা-পোস্টাপিস তাদের ভয়টা কিসের, তারা কেন তোয়াজ করতে যাবে ? দিন আটেক ঐ ইনস্পেক্টরকে পুরো বেলা উঠানে দাঁড় করিয়ে রাখব। ঘড়ি ধরে আপিসের তালা খুলব তখন।

সে সৌভাগ্যের দিন কবে আসবে, ঠিকঠিকানা নেই। মরীয়া হয়ে নিরঞ্জন একদিন সুজনপুরে রাখালরাজের কাছে গিয়ে পড়ল। অটল পিওনের ছেলে রাখালরাজ সাব-পোস্টমাস্টার হয়েছে, সে হিসাবে নিরঞ্জনের উপরওয়ালা। আশৈশব অন্তরঙ্গও বটে, উপরে বসেও রাখালরাজ পুরনো সম্পর্ক ভোলেনি।

নিরঞ্জন বলে, ইনস্পেক্টর সামলাও ভাই, তোমাদের সঙ্গে মহরম-মহরম—কায়দাকানুন করো একটা কিছু। আমি আর পেরে উঠছিনে, ফতুর হয়ে যাবার জোগাড়।

সবিস্তারে রাখালরাজ শুনল। হাসছে টিপে টিপে, রঙ্গ দেখছে। বলে, দীনেশ পেটুক বড্ড, কিন্তু মানুষটি ভাল। পেটেই খাবে, ক্ষতির কাজ কিছু করবে না। অন্য লোক হলে গলদ বের করার জন্য উঠে পড়ে লেগে যেত, ফন্দিফিকিরে যাতে নগদ রোজগারও হয়। নতুন মানুষ তুমি, এ লাইনে একেবারে কাঁচা। একটু চেষ্টা করলেই বিস্তর গলদ বেরুবে।

ঠিক বটে, এদিকটা নিরঞ্জন ভেবে দেখেনি। বলে, মেজাজি মানুষ উনি সত্যি। কাগজপত্র যেন বাঘ, তাকিয়েও দেখেন না। ঘুরে ঘুরে খিদে বাড়ান শুধু। ঘুমানো, ঘোরাঘুরি আর খাওয়া। যাবার মুখে খানকয়েক কাগজে সই মেরে খালাস।

তবে দেখ, সরকারি মানুষ হয়েও কতদূর ঋষিতপস্বী। এমন অস্থায়ী-পোস্টাপিস পরিদর্শনে যে মানুষ আসবে, সে-ই খাবে। দীনেশ তো মাছ-মাংস মিষ্টি-মিঠাই খায়, অন্য কেউ এলে শকুনির মতো তোমার যথাসর্বস্ব খুবলে খুবলে খেয়ে যেত।

নালিশ করতে এসে নিরঞ্জন অপ্রতিভ হয়ে পড়েছে। তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, খাওয়ার জন্যে ঠিক নয়। যখনই আসবেন, যথাসাধ্য খাওয়াবো। মাইনে পাই সাকুল্যে চার টাকা, অত ঘন ঘন না যদি আসেন—

আসে কি পোস্টাপিস দেখতে? অন্য কারণে আসে। থাকে আমাদের বাড়ি। সেই সময় একবার দুবার গিয়ে পোস্টাপিস দেখে আসে সরকার থেকে রাহা-খরচ আদায় করবে বলে। খাইয়ে-মানুষ —তোমার আয়োজন দেখে লোভ সামলাতে পারে না।

বোন ললিতা এখন বাড়িতে। দাদার কাছে এই সময়টা সে এসে পড়ল, কথাবার্তার মধ্যে এক পাশে দাঁড়িয়ে গেছে। রাখালরাজ মুখ টিপে হেসে তাকে বলে, কাণ্ড শুনলি দীনেশের! দুধসরে গিয়ে ধন্দুমার লাগায়। অমন হাঁউ-মাউ-খাউ এ জায়গায় চলে না, আমাদের বাড়ি কিছুতে তাই খেতে যায় না।

হেসে ললিতা মুখ ঘুরিয়ে নেয়। এতক্ষণে নিরঞ্জন তাকে ভাল করে দেখল। দেখে চোখ কপালে উঠে যায়। অনেক দিন দেখেনি ললিতাকে—এত বড়টি হয়ে গেছে! মেয়েরা যেন কি—একটা বয়সে পৌঁছলে কলাগাছের মতন রাতারাতি বড় হয়ে ওঠে।

বলে, এ সময়ে বাড়িতে যে তুমি? ইস্কুল তো খোলা।

উত্তর দিল ললিতা নয়, রাখালরাজ। বলে, টেস্ট দিয়ে বাড়ি চলে এসেছে। মিছে হস্টেলের খরচা টানি কেন? বাড়ি বসে পড়াশুনো করছে, একমাস পরে ফাইন্যাল। কি রে ললিতা, দরকার আছে কিছু?

ললিতা বলে, দু-তিনটে অঙ্ক বুঝে নিতে এসেছিলাম। থাক এখন।

থাকবে কেন রে, কী রাজকাযে আছি? লজ্জা হল নাকি তোর? কী সর্বনাশ, চিনতে পারিসনি—দুধসরের নিরঞ্জন।

ললিতা বলে, চিনব না কেন? তোমার যেমন কথা।

চেনার যদি কিছু মুশকিল হয়ে থাকে, সে তো নিরঞ্জনেরই। বিধাতা যেন ভেঙে আবার নতুন করে গড়েছেন ক'বছর আগেকার ডিগডিগে মেয়েটাকে। একটা কথা সকলের আগে ছাঁৎ করে নিরঞ্জনের মনে ওঠে—সুধসরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সুজনপুরও যদি বালিকা-বিদ্যালয় খুলে বসে, ললিতার সেখানে মিস্ট্রেস হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব হবে না।

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করে : পাশ-টাশ করে কি করবে ললিতা ? কলেজে পড়বে তো ?

পরম শুভার্থীর মতো জোর দিয়ে বলে, নিশ্চয় পড়বে। আরম্ভ যখন করেছ, থামাথামি নেই। হয়ে যাক তিনটে চারটে পাশ, কলকাতার মেয়ে-কলেজে প্রফেসার হবে তখন।

কেন আর ওকে ক্ষেপিয়ে দিচ্ছ ? রাখালরাজ বিষণ্ণ মুখে ঘাড় নাড়ে : কলেজে পড়ানোর অবস্থা কি আমাদের ? সরকারি বাসা পেয়ে সদরে থাকতে হল, কপালে ছিল একটু বিদ্যে—এই অবধি হয়েছে।

ললিতা জেদ ধরে বলে, পড়বই আমি দাদা। না পড়ে ছাড়ছি না। কাজকর্ম নিয়ে নেবো একটা. প্রাইভেটে পড়াশুনো করব।

অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে নিরঞ্জনের। কাজকর্মের মতলব মাথায় ঢুকে গেছে। সেই কাজ কী হতে পারে ? সুজনপুর বালিকা-বিদ্যালয়ে মাস্টারি—বাড়ি থেকে মাস্টারির সঙ্গে সঙ্গে দাদার কাছে পড়াশুনাও হতে পারবে। সুজনপুর বেশ খানিকটা খাটো হয়ে আছে—বালিকা-বিদ্যালয়ের কথা মাতব্বররা কি আর ভাবছে না ? এমন তৈরি মাস্টার হাতের কাছে পেয়ে ইস্কুল খুলতে কিছুমাত্র দেরি করবে না।

হেসে রাখালরাজ প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দেয় : কাজের ভাবনা কি ললিতা, কাজ তো মজুতই রয়েছে তোর জন্যে। কাজ দেবার জন্য মানুষটা ঘুরঘুর করে বেড়ায়। বাবাও মুকিয়ে আছেন, পাশ-ফেল যা হোক একটা হেস্তনেস্ত হলে সঙ্গে সঙ্গে বিদায় করবেন। ভাত রাঁধবি সেখানে গিয়ে, ছেলে ধরবি, বাসন মাজবি—আর কি কি করতে হবে ভগবান জানেন।

মুখ ফিরিয়ে রাখালরাজ নিরঞ্জনের দিকে সকৌতুকে চেয়ে বলে, তোমরাও রক্ষে পাবে তখন। পোস্টাপিসে ঘুরবার এত চাড় তখন আর ইনস্পেক্টরবাবুর থাকবে না।

হুঁ, বিদায় করলে গেলাম আর কি! যতবার তাড়াবে ফিরে ফিরে আসব দাদা।

বলতে বলতে ললিতা লজ্জা পেয়ে ভিন-গাঁয়ের মানুষটির সামনে থেকে পালিয়ে যায়।

॥ আট ॥

একদিন এক দুরন্ত হাসির ব্যাপার—ডাকের ব্যাগের সিলমোহর-করা দড়ি কেটে উপুড় করতেই বেড়িয়ে পড়ল ডুমুর একটা।

ডুমুর কেন রে নীলমণি, চিঠিপত্তোর কোথা?

নীলমণি হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে: পোস্টমাস্টার মস্করা করেছেন তোমার সঙ্গে। চিঠি একখানাও নেই। বললেন, এই কাঠ-ফাটা রোদ্দুরে খালি ব্যাগ বয়ে নিয়ে যাবি কেন রে, একটা ফল দিয়ে দিই। গাছ থেকে একটা ডুমুর ছিঁড়ে দিয়ে বললেন, চিঠির বদলে আজ ফলো-ডুমুর। ভারি আমুদে মানুষ উনি।

নিরঞ্জন খিঁচিয়ে ওঠে: সর্বনাশের জোগাড়—আর তুই আমোদ পেলি এর মধ্যে। ইনস্পেক্টরের তোয়াজ কিসে কমানো যায়—রাখালরাজের কাছে আমি সেই ব্যবস্থায় গিয়েছিলাম। তোয়াজ যে এখন দুনো-তেদুনো করতে হবে!! ছ-মাইল পথ ভেঙে খালি মেলব্যাগ আনলি—তাই নিয়ে কেমন করে তোর হাসি আসে, বুঝতে পারিনে।

সদুঃখে বলে, যা-কিছু আমি করতে যাই কোনটাই জমতে চায় না। বালিকা-বিদ্যালয়ে গোড়ায় গোড়ায় মেয়ে কুড়ির উপর উঠে গিয়েছিল। বাড়বে কোথা দিনকে দিন, দৃষ্টান্ত দেখে ঘরে ঘরে সবাই ইস্কুলে মেয়ে পাঠাবে—তা নয়, কমতে কমতে এখন ছ'সাতটায় ঠেকল। সেখানেও এমনি ফলো-ডুমুরের দশা—হয়তো খালি বেঞ্চিগুলোকেই কাঞ্চনের পড়িয়ে যেতে হবে। পোস্টাপিস খুলে কতবড় আশা, খাম-পোস্টকার্ডে পয়লা দিনই আঠারোখানা এলো—

সেই গৌরব-দিনের কথা নীলমণিরও সুস্পষ্ট মনে আছে। সে জুড়ে দেয়: গিয়েছিল এখান থেকে বত্রিশখানা। তার উপরে রেজেস্ট্রি দুটো, মনিঅর্ডার একটা দশ টাকার—

নিরঞ্জন বলে, উঠে-পড়ে না লাগলে উপায় নেই রে নীলমণি। ইস্কুলের ব্যাপারে কাঞ্চনকেও বললাম সেই কথা। এমনি চললে পোস্টাপিস-ইস্কুল দুই-ই উঠে যাবে, সুজনপুর স্ফূর্তিতে বগল বাজাবে। চিঠির বদলে দু-এক দিন ডুমুর এলে তেমন মারাত্মক হয় না, কিন্তু রেজেস্ট্রি-প্যাকেট, মনিঅর্ডার এ সবের হিসাব থাকে। শ্রীপঞ্চের পোলের ধারে তবলদাররা এসে নাকি বাসা করেছে, তাদের কাছে গিয়ে খবরাখবর নে নীলমণি। একশো টাকা পাঠালে কমিশন দু-আনা ছাড় পাবে।

খেজুরগুড়ের অঞ্চল—খেজুররস জ্বাল দেবার জন্য শীতকালে কাঠকুটোর প্রয়োজন পড়ে। প্রকাণ্ড আকারের কুড়াল নিয়ে এই সময়ে কটক ও পুরী জেলা থেকে কাঠ চেলা করবার মানুষ আসে। তবলদার বলে তাদের। বিস্তর রোজগার করে তারা এক এক মরশুমে, দেশেঘরে টাকা পাঠায়। একশো টাকা পাঠাতে ডাকখরচা এক টাকা—নীলমণি গিয়ে তদ্বির করছে, টাকাটা দুধসর পোস্টাপিসের মারফতে পাঠালে টাকার জায়গায় চোদ্দ আনা কমিশন নেওয়া হবে। বাকি দু-আনার পূরণ দেবে পোস্টমাস্টার নিরঞ্জন মাইনে ঐ চারের ভিতর থেকে। নতুন পোস্টাপিস বাঁচাবার এই সমস্ত প্রক্রিয়া।

শুধুমাত্র নীলমণির উপর নির্ভর না করে নিরঞ্জন নিজে চলল ভিন্ন এক খানে—কাবুলিওয়ালাদের ডেরায়। কম্বল-আলোয়ান নিয়ে ফি বছর শীতকালে আসে তারা, গরম-কাপড় ধারে বিক্রি করে। ও-বছরের টাকা এ-বছর উশুল করে, আদায়ি টাকাকড়ি কলকাতায় আত্মজনের কাছে পাঠিয়ে দেয়। সকলের সব টাকা একত্র করে তারা কাবুলরাজ্যে চালানের বন্দোবস্ত করে। সেই ডেরা সুজনপুর পোস্টাপিসের এলাকার মধ্যে, তবু নিরঞ্জন তাদের মধ্যে গিয়ে পড়ে: আমার ওখান থেকে টাকা পাঠাও খাঁ-সাহেব। সবই সরকারি আপিস—যেখান থেকে পাঠাও ঠিক গিয়ে পৌঁছবে। দুধসর পোস্টাপিস উপরন্তু এই দু-আনার সুবিধা দিচ্ছে।

কোথাও কিছু নয়, হঠাৎ কাঞ্চন একদিন মনি-অর্ডারের ফরম পূরণ করে নিয়ে এলো। পনের টাকা পাঠাচ্ছে কলকাতার মঞ্জুলা নামে মেয়ের কাছে। আর এক খামের চিঠি ঐ মঞ্জুলার নামে। বলে, এই চিঠি অন্তত গাপ করবেন না। পাঠাবেন।

নিরঞ্জন আকাশ থেকে পড়েঃ কোন্ চিঠি আমি না পাঠাই? টিকিট মেরে ছাড়লেই বাপ-বাপ বলে পাঠাতে হবে। টিকিট না থাকলেও বেয়ারিং করে পাঠাই। আইনের দস্তুর।

তিক্তকণ্ঠে কাঞ্চন বলে, সে আইন ভারতবর্ষ জুড়ে। কেবল আপনার ছুধসরে এসে পৌছয়নি। সে যাকগে—হাতে-নাতে যেদিন ধরতে পারব, তখন সে কথা। কিন্তু এই চিঠি ঠিক মতো যেন গিয়ে পৌছায়। পোস্টাপিসের স্বার্থে। এত করে কেনই বা বলি —সব চিঠি খুলে পড়েন, এ চিঠি পড়ে নিজেই সেটা বুঝতে পারবেন।

নিরঞ্জন জিভ কেটে বলতে যায়, পরের চিঠি খুলে পড়ি—কী সর্বনেশে কথা বলছ তুমি!

কিন্তু বলছে এসব কার কাছে! জবাবের প্রত্যাশা না করে চিঠি ও মনি-অর্ডার রেখে কাঞ্চন ফরফর করে তার ইস্কুলের দিকে চলল। ইস্কুল করতে করতেই পোস্টাপিসের কাজে এসেছিল।

অমন বলে আরও তো কৌতূহল বাড়িয়ে দিয়ে গেল। চিঠি যদিই বা না দেখত, এখন আর না দেখে কোনক্রমে পারা যায় না। বাটি-ভরা জল পাশে নিয়ে নিরঞ্জন পোস্টাপিসে কাজে বসে। খামের মুখে জল দিয়ে খুলতে হয়। রাস্তাপথে যেমন লোকের চলাচল, ডাকের পথে তেমনি মনের চলাচল। আস্ত এক ডাকঘর নিরঞ্জন আগলে বসে আছে, দায়িত্ব বিষম বই কি! হাতের উপর দিয়ে কী ধরনের কথাবার্তা ভাবনাচিন্তা যায় আসে, দেখে-শুনে বুঝে-সমঝে তবে সেগুলো ছাড়তে হয়। এই দিক দিয়ে পোস্টাপিসের এমন মাহাত্ম্য, আগে কিন্তু মাথায় আসেনি—পোস্টমাস্টারের টুলে বসে এখন সব বুঝছে। গ্রামে গ্রামে পোস্টাপিস হওয়া উচিত, এবং দায়িত্বশীল ঝানু একজনে

পোস্টমাস্টার হবেন। আগেকার দিনের সমাজপতির মতন। অথবা অন্তর্যামী দেবতার মতন। দেবতা গোটা বিশ্বভুবনের অন্তরের খবর রাখেন, পোস্টমাস্টার নিরঞ্জন শুধুমাত্র তুধসরের। অতএব ছোট্ট মাপের দেবতা।

কাঞ্চন চিঠি দিয়ে গেল কলকাতার মঞ্জুলা নামে একজনকে। বান্ধবী, সেটা বোঝা যাচ্ছে। আদ্যন্ত পড়ে নিরঞ্জন মুগ্ধ হয়ে যায়। বদমেজাজি মেয়েটা ভিতরে ভিতরে এমন, বাইরে দেখে কিছুমাত্র বোঝা যায় না। মঞ্জুলাকে লিখেছে, এই পনের টাকা হাতে পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে সে আবার মনিঅর্ডার করবে কাঞ্চনের নামে। কমিশনের খরচা মঞ্জুলারই —তাদের তুধসর পোস্টাপিসের দরুন চাঁদা। টাকা ফেরত পেয়ে কাঞ্চন আবার পাঠাবে, এবং তার পরে মঞ্জুলাও। অনন্তকাল ধরে চলল। টাকা ছুটোছুটি করছে, মনিঅর্ডার আসা-যাওয়ার হিসাব বাড়ছে পোস্টাপিসে। ভারি সাফ মাথা কাঞ্চনের। গ্রাম ছাড়ব-ছাড়ব করে, কিন্তু ভাবেও তো খুব গ্রামের কথা। নিরঞ্জনের মতোই ভাবে। ভেবে ভেবে এই তাজ্জব বুদ্ধি বের করেছে।

চিঠি না পড়ে একখানাও বিলি হয় না, ব্যাপারটা ক্রমশ চাউর হয়ে পড়ছে। এই নিয়ে একদিন বিষম হৈ-চৈ।

নিরঞ্জন সন্ধ্যার মুখে পুরঞ্জয়ের বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছে, অজয় ডাকে : কে যায়, পোস্টমাস্টার নাকি ? শুনে যাও এদিকে।

ভারী গলা। নির:নের মনে পাপ রয়েছে, ডাকের ধরনটা ভাল বলে মনে হল না। পায়ের জোর বাড়িয়ে দেয়।

বিজয়ও সেখানে, সে হুঙ্কার দিয়ে উঠল : দাদা ডাকছেন, তোমার বুঝি কানে গেল না ?

নিরঞ্জন বলে, চিঠি ক'খানা বিলি করে আসি ভাই। ফেরার সময় দেখা করে যাব।

এক্ষুনি এসো বলছি —

গোঁয়ার-গোবিন্দ মানুষ বিজয়—মুখের তাড়নায় শেষ হয় না, ছুটে বেরিয়ে পথ আটকে দাঁড়াল।

অজয়ও চলে এসেছে। দু-ভায়ের মধ্যে গলা কারো খাটো নয়। মানুষ জমছে মজা দেখবার জন্য। এক কথায় দুকথায় পথের উপরেই তুমুল হয়ে উঠল।

সকলের দিকে চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে নালিশ জানাবার ভঙ্গিতে অজয় বলে, ভোররাত্রে হারাধন ধাড়ার বাড়ি পেয়াদা নিয়ে অস্থাবর ক্রোক করতে গিয়েছিলাম। কি করব, চার বছরের মধ্যে ধাড়ার-পো খাজনাকড়ি উপুড়-হস্ত করে না।

নিরঞ্জন নিরীহ ভাবে মন্তব্য করে : ভারি অন্যায় তো!

তার দিকে দৃষ্টিমাত্র না দিয়ে অজয় বলছে, আদায় নেই এক পয়সা। উল্টে একগাদা খরচা করে ডিক্রি করলাম, ডিক্রি জারি করে অস্থাবর ক্রোকের পরোয়ানা বের করলাম, পনের-বিশ জন লোক জুটিয়ে শীতের মধ্যে ঠুরঠুর করে কাঁপতে কাঁপতে ধাড়ার বাড়ি গিয়ে উঠলাম—

কৌতূহল আর দমন করতে পারছে না তেমনি ভাবে নিরঞ্জন বলে, তারপর '

অজয় বলে যাচ্ছে, গিয়ে দেখি ভো-ভোঁ। গোয়ালে গরু নেই, রান্নাঘরে থালাবাসন নেই, ঘরে চৌকিতক্তাপোষ অবধি নেই। থাকবার মধ্যে ছেঁড়া-মাদুর আর মাটির হাঁড়ি কলসি গোটা কতক। জিনিসপত্র এর বাড়ি তার বাড়ি সরিয়ে দিয়ে শ্মশানবাসী ভোলানাথ হয়ে আছে।

নিরঞ্জন বলে, ভারি শয়তান তো!

বিজয় এতক্ষণ চেপেচুপে ছিল, দাদা বলছে তার মধ্যে আগ বাড়িয়ে কিছু বলতে যায়নি। এবারে গর্জন করে উঠল : শয়তান তুমি—

কঠিন হাতে নিরঞ্জনের কাঁধ চেপে ধরল : আমাদের সঙ্গে কি শত্রুতা বল্যে। এককথায় বাবা অমন খেয়াঘাটের ইজারা দান করে গেলেন,

আমরা কেউ টু-শব্দটি করলাম না। তারই শোধ নিচ্ছ এমনি করে?

হাত সরিয়ে দিয়ে নিরঞ্জন বিস্ময়ের ভান করে বলে, কি করলাম, বলবে তো সেটা খুলে।

ক্রোকের পরোয়ানা বেরিয়েছে, পেয়াদা দু-এক দিনের মধ্যে গিয়ে হাজির হবে—মুহুরি চিঠি লিখেছিল আমাদের। সেই চিঠি খুলে পড়ে হারাধনকে তুমি বলে এসেছ। বাড়ি সে একেবারে সাফসাফাই করে রেখেছে। তুমি ভিতরে আছ, তা ছাড়া হতেই পারে না এমন।

অজয়ের কি মনে হয়েছে, ছুটে গিয়ে মুহুরির সেই চিঠি এনে সকলকে দেখায়ঃ যা বলছি, ঠিক কিনা হাতে নিয়ে দেখুন। ডাকের সিলটা দেখুন একবার নিরিখ করে।

খামের এক পাশ ছিঁড়ে এরা চিঠি বের করেছে। কিন্তু তার আগে সন্তর্পণে খাম যে একবার খোলা হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। জোড়ের মুখে ডাকের সিল পড়েছে—সিলের দুই খণ্ড এক হয়ে মেলেনি, মাঝে কিঞ্চিৎ ফাঁক। অর্থাৎ পাঠাস্তে আঁটবার সময়টা অতদূর নিরঞ্জন খেয়াল করতে পারেনি।

এই তো সঙ্গিন অবস্থা—তার উপর কাঞ্চন এসে পড়ল রঙ্গস্থলে। আগ বাড়িয়ে সাক্ষি দেয়ঃ হ্যাঁ, পড়েন ইনি সমস্ত চিঠি। আপনাদের চিঠি তবু তো এসে পৌঁচেছে, আমার চিঠির অর্ধেকগুলো লোপাট হয়ে যায়। ঝাড়ু মারি গাঁয়ের পোস্টাপিসে—সুজনপুর থেকে চিঠি দিয়ে যেত, সে অনেক ভালো ছিল। আবার তাই হোক, উঠে যাক আপদবালাই।

নিরঞ্জন এবার রীতিমতো ক্রুদ্ধ হয়েছে। বলে, কোন চিঠি কবে লোপাট হল, বলো এই দশের মুকাবেলা। আজামৌজা কলঙ্ক দিলে হবে না।

কাঞ্চনও সমান তেজে বলে, অনেক—অনেক। একখানা দুখানা

নয়। আমি সব টের পাই। কলকাতায় রাণীশঙ্করী লেনের একটা বাড়ি, মামাদের বন্ধু তাঁরা সব, আমি সে বাড়ি মেয়ের মতো—এত দিনের মধ্যে তাঁরা একখানা চিঠি লেখেননি, কক্ষনো তা হতে পারে না। সুজনপুরের আমলে হপ্তায় হপ্তায় পেয়েছি। আপনি চিঠি নষ্ট করে ফেলেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার হয়েছে, জায়গাটাও গাছতলা। মেয়েটার চোখের জল এসে পড়েছে কিনা ঠাহর হয় না, কিন্তু ভিজে-ভিজে গলা।

ঘাড় নেড়ে নিরঞ্জন প্রবল প্রতিবাদ করে: লেখেনি তাঁরা চিঠি। লেখেনি, লেখেনি। না লিখলে আমি কি নিজে লিখে বেনামিতে পাঠাব?

ঝগড়াঝাঁটি অন্তে নিরঞ্জন একসময় বাড়ি ফিরল।

নীলমণি বলে, পরের চিঠি পড়া পাপ। কেন যাও নিরঞ্জনদা, ওইসব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে? যেমন যেমন চিঠিপত্তোর এলো, বিলি করে দিলে। ল্যাঠা চুকে গেল।

দেখব না শুনব না—কেন রে, টিনের ডাকবাক্স নাকি আমি। নিরঞ্জন তম্বি করছে: খুলে থাকি আমি চিঠি, বেশ করি। একশোবার খুলব। ছেলেপুলে নিয়ে হারাধন উপোস করে মরছে, পেয়াদা এনে ওরা তার ঘটি-বাটি গরু-বাছুর নিয়ে নিলামে চড়াত। ভাগ্যিস খুলেছিলাম চিঠি, এ-যাত্রা ধাড়ার-পো বেঁচে গেল। লোকের ভাল করব, জুলুম ঠেকাব, নইলে এসব পাবলিক-কাজের মানেটা কি?

তারপর বিষণ্ণ কণ্ঠে বলে, এমনি তো কাঞ্চন পোস্টাপিসের জন্য কত করে, ক্ষেপে গিয়ে সে-ই আজ দশের মধ্যে পোস্টাপিস উঠে যাওয়ার কথা বলল। মুখ দিয়ে বের হল এমন কথা! সমর গুহ চিঠিপত্তোর লেখে না, সে যেন আমার দোষ।

গলা খাটো করে বলে, শোন্ তবে নীলমণি, ঐ সমরের বাড়ি অবধি চলে গিয়েছিলাম, রাণীশঙ্করী লেনে। তুধসর গ্রাম বলতে যে-মানুষ চিনতেই পারে না, সে আবার লিখবে চিঠি!

নিজেরই মনে যেন সাহস সঞ্চয় করছে। বলে, মরুক্ গে যাক। দীনেশ যতদিন ইনস্পেক্টর, বেকায়দায় ফেলতে পারবে না কেউ। রাখালরাজের খাতিরের লোক—বোনাই হবে তার, ললিতার সঙ্গে বিয়ে হবে। রামপাখি আর নলেনগুড় তো সামান্য বস্তু, আকাশের চাঁদ চেয়ে বসলে তাই পেড়ে দিতে হবে রে নীলমণি। আবার কবে এসে পড়ে—ভাল মোরগ ঠিক করে রাখ, ছাগল-ভেড়ার উপর দিয়ে যায় এমনি সাইজের মোরগ। আর গুড়ের ভাঁড়ের কথা বলে গেছে—ভাঁড় নয়, কলসি। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল ত্রিভুবন খুঁজে নিয়ে আসবি—দেখি কোন বেটা কি করতে পারে আমাদের পোস্টাপিসের।

বেশি দেরি হল না। নতুন মাস পড়তেই খবর এসে গেল, ইনস্পেক্টর আসছেন পরিদর্শনে। সুজনপুর সাব-অফিসে এসে গেছেন, সে খবরও এলো।

দেখবি রে নীলমণি, রামপাখির কথাটা কোন ক্রমে চাউর না হয়। রান্নাঘরে ও-জিনিস উঠবে না। সানুদি টের পেলে রান্না-করা ম্লেচ্ছ তরকারিতে গোবরের তাল ছুঁড়ে দেবেন। যজ্ঞি নষ্ট হবে। খাইয়ে-লোকের ভোজনে বিপাক ঘটলে দায় হবে উঠবে পোস্টাপিস বজায় রাখা।

মোরগ কেটেকুটে নীলমণি তৈরী মাংস নিয়ে এসেছে। সানুদিকে নিরঞ্জন বলে, কড়া পেয়াজ-রশুনের কোরমা খেতে চেয়েচেন ইনস্পেক্টর, সে জিনিস তোমার হাতে হবে না। আমি নিজে রান্না করব—জিজ্ঞাসাবাদ করে আর রান্নার বই পড়ে রপ্ত করে নিয়েছি।

বাড়ির বাইরে গোয়াল। গোমাতার বসতিস্থান, সে জায়গা কোনক্রমে অশুচি হয় না। ইট সাজিয়ে উনুন বানিয়ে মাটির কড়াইয়ে সেই আশ্চর্য কোরমা চাপানো হয়েছে। কিন্তু শুরুতেই গোলমাল—উনুন বেয়াড়াপনা করছে। ফুঁ দিতে দিতে দু'চোখ জলে ভরে গেল। অতিথি কখন এসে পড়ে, ঐ বুঝি সাইকেলের কিড়িং-কিড়িং—মনের

উদ্বেগে প্রাণপণ শক্তিতে যত ফুঁ পাড়ে, ধোঁয়াই কেবল বাড়ছে, আগুনের চিহ্নমাত্র নেই।

একবার হঠাৎ পিছন তাকিয়ে দেখে কাঞ্চন। নিরঞ্জনের দুর্গতি মজা করে উপভোগ করতে এসেছে। হাসছে টিপিটিপি। শুকনো নারকেলপাতা আনা হয়েছে, সমস্তগুলো উনুনে ঠেসে দিল, প্রচুর রসদ পেয়ে খুশি হয়ে উনুন যদি ধরে যায় এবার।

কাঞ্চন ভালমানুষের ভাবে বলে, কাঠ-পাতার হাঙ্গামা কেন? কাগজ তাড়া তাড়া ধরে যায়—চিঠিপত্তোর নেই?

চিঠি?

খুঁজিয়েই তো পাবেন—

ঝগড়ার জন্য তৈরি হয়ে এসেছে। হয়তো বা ইনস্পেক্টরের কানে উঠেছে, [illegible] মন্ত্রণা দিয়ে দিচ্ছে। নিরঞ্জন ক্ষেপে গেল: উঃ, কত চিঠি আসে কিনা রোজ! যাই মাস্টারকে দেবো, আপনার উনুনে পোড়াবো। সে নয় [illegible] সাব-পোস্টাপিস—কিছুই আসে, [illegible] পার্সেলও পাঠাতে পারে।

কথার মধ্যে কাঞ্চন একেবারে গায়ের উপর এসে পড়েছে। ধাক্কা দিল নিরঞ্জনকে: সরুন দিকি—

নিরঞ্জনকে সরিয়ে জায়গা করে নিয়ে হাঁটু গেড়ে মাথা নিচু করে ফুঁ দিচ্ছে। এক ফুঁয়েই উনুন দপ করে জ্বলে উঠল।

নিরঞ্জন অবাক হয়ে বলে, কী আশ্চর্য, যেন মন্ত্রের ব্যাপার। আমি এতক্ষণ ধরে এত চেষ্টা করছি—

সকলে সব জিনিস পারে না, যার যে কাজ।

এর ভিতরেও খোঁটার কথা এসে পড়ল। কাঞ্চন বলে, ডাকের চিঠি যত আঁটাই থাক, আঙুল বুলিয়ে আলগোছে আপনি খুলে ফেলেন। আমরা অমন পারব না। তা-ও লোকে বলতে পারে মন্ত্রের ব্যাপার!

ঝগড়াঝাঁটির মধ্যে নিরঞ্জন যাবে না। বিশেষ করে এই সময়টা

—ইনস্পেক্টর আমার মুখটায়। সহজ ভাবে বলে, শহরে ছিলে তো তুমি। উনুনের কায়দা-কানুন জানলে কি করে ?

শহরের মানুষও উনুন ধরিয়ে ভাত রেঁধে খায় নিরঞ্জনদা। শহুরের ভাত আকাশ থেকে পড়ে না।

নিরঞ্জন নিরীহ ভাবে বলে, কী জানি। শহরের আলো দেশলাই জ্বেলে ধরাতে হয় না, শহরের জল কলসি ভরে আনতে হয় না ; কল টিপলে আপনা-আপনি সব এসে যায়। আমি ভাবতাম, ভাতও বুঝি তেমনি আগুন-উনুন-চাল জল কিছু লাগে না, কল টিপলেই থালার উপর ঝুরঝুর করে পড়ে। শহরের মানুষ আমাদেরই মতন উনুন ধরিয়ে রাঁধে—ভারি আশ্চর্য তো !

শহরের মানুষ মোরগের কোরমা কেমন রাঁধে তা-ও দেখিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজ-রসুন কুচিয়ে রেখেছেন—এতে হবে না, বেটে ফেলুন শিল পেতে।

পরম আপ্যায়িত হয়ে নিরঞ্জন বলে, বেশ তো বেশ তো, দেখিয়ে বুঝিয়ে দাও, কতটা কি লাগবে।

বাড়ির ভিতরে ইঙ্গিত করে নিরঞ্জন চুপি চুপি বলে, মোরগ নয় কিন্তু কাঞ্চন, খাসিছাগলের নামে চলেছে। মোরগ টের পেলে সানুদি আমাদেরই জবাই করবে।

হোক না ছাগল। রান্নার সেজন্য ইতর বিশেষ হবে না। কিন্তু এটা কি—খাসিছাগলের পাখনা দুটো একেবারে যে আস্ত রয়ে গেছে। বাটনার দিকে চেয়ে প্রসন্ন কণ্ঠে বলে, পেঁয়াজ বেশ চন্দনের মতো করে বেটেছেন—বাঃ, বাটনায় দিব্যি হাত তো আপনার !

বলে, ধনে জিরেমরিচ বেটে দিন এইবার—

সেটা হতে না হতে—এই যাঃ, আদা বাটনাও নেই যে। বাটুন বাটুন—ছিবড়ে থাকলে কিন্তু হবে না। আপনি খাসা বাটেন।

বলে, জল ফুরিয়েছে— জল আনুন এক ঘটি।

স্থির হয়ে এক লহমা বসতে দেবে না। বলে, কুচোকা

খানকতক কুড়িয়ে আনুন দিকি। মাংস ধীর-জ্বালে হবে। বড়-কাঠ দাউ দাউ করে জ্বলে. ওতে হবে না।

নিরঞ্জন বলে, আমিই বরঞ্চ রান্না করি। তুমি এই সমস্ত জোগান দাও।

অত সহজ নয় রান্না—

এক জায়গায় বসে বসে হুকুম-হাকাম ছাড়া- কঠিন বলেও তো মনে হয় না। ইচ্ছে করে তুমি খাটাচ্ছ।

বলতে বলতে নিরঞ্জন মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে পড়ে কাঞ্চনের দিকে। গাঢ়স্বরে বলে, এত ভালবাসা তুখসরের উপর—দায়ে-বেদায়ে ঝাঁপিয়ে এসে পড়ো, ডাকতে হয় না। কমিশন-খরচা করে মনি-অর্ডার করো পোস্টাপিসের আয় দেখানোর জন্য। ছটফটানি তবে আর কি জন্যে শুনি? গ্রাম ছেড়ে কখনো যাবে না, এই বকমটা ভেবে নিয়ে মনেপ্রাণে কাজকর্মে লেগে যাও।

আপনাকে বিয়ে করে— কেমন?

থতমত খেয়ে নিরঞ্জন হঠাৎ জবাব দিতে পারে না।

শহুরে মেয়ে বিয়ে করবার বড্ড লোভ, উঁ?

নিরঞ্জন আমতা-আমতা করে বলে, শহুরে হলেই কি মন্দ হয়? এই যেমন তুমি। পিঁড়ি পেতে বসে দিব্যি তো রান্নাবান্না করছ। গাঁয়ে শহরে তফাত কি তবে রইল? তবে কাঁজটা কিছু দেখা যায় তোমার। বিদ্যের কাঁজ। ও আর কদিন? গাঁয়ের মধ্যে থাকতে থাকতে ফুরিয়ে যাবে। সত্যি কাঞ্চন, তোমায় বাদ দিয়ে আমাদের চলবার উপায় নেই।

আর যাবে কোথা? কাঞ্চনের কণ্ঠস্বর মুহূর্তে তীব্র তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। কুটন্ত পদ্মের ভিতর থেকে ফোঁস করে সাপ বেরুনোর মতো। বলে, দাদার সঙ্গে সেই ষড়যন্ত্র। কলকাতায় গিয়ে দাদাকে জপিয়ে এসেছিলেন। প্রত্যেক চিঠিতে দাদার ঐ একমাত্র কথা। দাদাকে নিশ্চয় আপনি উসকে দিয়ে যাচ্ছেন।

আজকেই বেণুধরের চিঠি দিয়ে এসেছে, কাঞ্চন ফস করে চিঠি বের করল। চিঠি পড়ে খুশি হলে তবেই সে চিঠি বিলি হয়, নয় তো গাপ করে ফেলেন আপনি। রাণীশঙ্করী লেনের চিঠি আসে না, দাদার চিঠি ঠিক-ঠিক এসে যায়। জানেন যে দাদাকে কষ্ট দিতে চাইনে, দাদার কথা বড্ড মানি আমি

ইনস্পেক্টর আসছে, এ সময়টা নিরঞ্জন কিছুতেই গণ্ডগোলে যাবে না। ভাব রেখে চলবে। সহাস্যে বলে, তার আর কি। যে রকম লিখেছে করে ফেল তাই তাড়াতাড়ি। পাঁজি দেখে তুমিই না হয় তারিখ ঠিক করে লিখে দাও। তোমার লজ্জা করে তো আমি লিখতে পারি। ছুটি নিয়ে বেশ চলে আসুক।

কঠিন কণ্ঠে কাঞ্চন বলে, আপনাকেই যে অপছন্দ আমার।

তাচ্ছিল্যের সুরে কিছু না বলে, সেটা ঠিক বলেছ। পড়ে পড়ে আছি, লেখাপড়া জানিনে, চাকরি-বাকরি করিনে। উঁহু, ভুল বললাম—চাকরি বাকরি বই কি। খোদ ভারত গবর্ণমেন্টের চাকরি। তবে মাইনে হল চার টাকা। মাইনের কথা শুনে সব মেয়েই নাক সিঁটকে তুলবে। তা হলেও সাধুসন্ন্যাসী নই, মাইনে চার টাকা হোক আর চার পয়সাই হোক বিয়ে কোন একটা মেয়েকে করতেই হবে—

কাঞ্চনও বুঝি কৌতুক পেয়ে গেছে। কিংবা লজ্জা পেয়েছে মুখের উপর এমন কথাটা বলে ফেলে। বলে, অপছন্দের বিয়ে ঝগড়াঝাঁটি হবে, জীবনে শান্তি থাকবে না যে।

বিয়ে করব আর ঝগড়াঝাঁটি করব না, তাই কখনো হয় নাকি! পছন্দের বিয়েও দেখেছি। হাতের কাছে আমাদের কালী চক্কোত্তি মশায়ের ছেলে সমীরণ। বাপের অমত বলে রেজেস্ট্রি বিয়ে করে এলো, নিয়মদস্তুর দুজনের 'সখি আমায় ধরো ধরো' ভাব গোড়ার কয়েকটা দিন, তার পরেই নিজমূর্তি বেরুল। বউ কিল ঝাড়ছে, বর ঘুসি ঝাড়ছে। শেষটা আদালতে। কালী চক্কোত্তির বেটা এখন মাসে মাসে পনের টাকা খোরপোষ গণে যাচ্ছে। আমাদের

বাড়িতে নেমন্তন্ন করে খাওয়ায়। বেশি রকম জমে যাওয়ার পর কাকাবাবুর সঙ্গে কাকীমা এবং তাঁদের ভাগনিটিকেও নিমন্ত্রণ করে। দীর্ঘকাল ধরে অতি দুশ্চর সাধনা। সমরই একদিন বড় আবেগের মুখে কাঞ্চনের কাছে বলে ফেলেছিল।

এবং শুধুমাত্র সমর একলা একজন নয়। ঘটক সম্বন্ধ জুটিয়ে আনত—পাত্রপক্ষ থেকে পাত্রীকে নিয়ে কোন দিন কোন কথা ওঠেনি। এক কথায় মেনে নিয়েছে, কনে সুন্দরী বটে। পছন্দ-অপছন্দ পাত্রেরই সম্পর্কে শুধু। এতকাল পরে এই একটা মানুষ পাওয়া গেল, কাঞ্চনের গায়ের জলুস যে তাকিয়ে দেখেনি। তবে ভরসা করা যায়, দীর্ঘকাল থাকতে থাকতে কোন এক সময় নজরে পড়ে যেতেও পারে।

মাংস সম্বরা দিল কাঞ্চন এইবার। ঘি কড়া হয়ে গিয়েছিল, কড়াইয়ের উপর দপ করে এক ঝলক আগুন। তারপর টগবগ করে ফুটতে লাগল। হঠাৎ কাঞ্চন বলে, একটা কথা বলি। দিনকে-দিন মর্মান্তিক হয়ে উঠছে। পোস্টাপিস টিকিয়ে রাখা সত্যিই মুশকিল হবে। পেরে উঠবেন না আপনি।

নিরঞ্জন বলে, অজয় বিজয় ওরা দু-ভাই বড্ড ক্ষেপেছে। তুমি থাকো আমাদের দিকে, কেউ কিছু করতে পারবে না।

আমিই তো সকলের বড় শত্রু –

হেসে নিরঞ্জন বলে, তাই বুঝি। নমুনাও দেখছি বটে, কলকাতায় মঙ্গলা দেবীকে মনিঅর্ডার করা, আজকে এই মাংস রাঁধতে এসে বসা।

সে কথা কানে না নিয়ে কাঞ্চন বলে চলেছে, সব চেয়ে বেশি করে লেগেছেন আপনি আমার সঙ্গে। দাদার চিঠিটা তবু দিয়েছেন শেষ পর্যন্ত। বিস্তর চিঠি গাপ করেন –একটা দুটো নয়, অনেক সে সব চিঠি আপনার পছন্দসই নয় বলে।

নিরঞ্জন ঘাড় নেড়ে প্রবল প্রতিবাদ করে: মিছে কথা, প্রমাণ দেখাও।

পিওনমশায়ের আমলে কলকাতা থেকে কত জনের কত চিঠি আসত।

এখনো এসে থাকে। আজকেই দিয়েছি বেণধরের চিঠি। কালও দিয়েছি। পরশুদিনটা বাদ গেছে, তার আগেও কত কত দিয়েছি। কিছু মনে কোরো না কাঞ্চন, তোমার লোভের অন্ত নেই। পোস্টাপিসে যত চিঠি আসে, সবগুলো তোমায় দিলে তবে বোধহয় খুশী হও।

কাঞ্চন বলে, চিঠি যেন দয়া করে দেন। দিচ্ছেন যেন আপনিই। যে চিঠি আসে, প্রায়ই তো বাজেবাজে। দরকারি চিঠিগুলো মারা যায়।

(সে কি আর বুঝিনে চাঁদ, সমর গুহ ছাড়া তোমার কাছে কারও চিঠি দরকারি নয়। সে চিঠি কোনদিন আসবে না—অঙ্কুরে বিনাশ হলে ফল ধরবে আব কেমন করে।)

নিরঞ্জনের হাসি পাচ্ছে কাঞ্চনের কথা শুনে। সত্যি সত্যি হেসে না ফেলে। কাঞ্চন তো ইনিয়ে-বিনিয়ে কত লেখে—আগে বিস্তর লিখত, জবাব না পেয়ে পেয়ে এখন কমিয়ে দিয়েছে। কিন্তু গ্রামেরও অপমানবোধ আছে—ছুধসর নামটাই যে পাজি মানুষ কোনক্রমে মনে আনতে পারল না, কাঞ্চনের বাপ ভাইয়ের গ্রাম, কাঞ্চন নিজে সেখানে রয়েছে, এসব কোন খাতিরেই নয়—তার নামের চিঠি কোনদিন ছুধসরের পোস্টাপিস থেকে মেলব্যাগে উঠবে না। তা কাঞ্চন-মালা, যতই তুমি কোমর বেঁধে ঝগড়া করো না কেন।

সাইকেল বাজিয়ে ইনস্পেক্টর এসে পড়াতে ঝগড়া বন্ধ করে কাঞ্চন সরে গেল। রাস্তা অবধি ছুটে গিয়ে নিরঞ্জন খাতির করে। সাই-কেলটা নিয়ে নিরঞ্জন যথারীতি দাওয়ার উপর তুলে রাখছে, দীনেশ না-না করে উঠল: উঠোনেই থাকুক। কাজ সেরে আবার তো এক্ষুনি রওনা হয়ে পড়ব।

অবাক কাণ্ড। আসা-যাওয়া ইনস্পেক্টরের এই প্রথম নয়, এমন ব্যাপার কোনদিন হয়নি। সাইকেল অন্ততপক্ষে এইদিনটা ছুটি ভোগ করবেই, এই রীতি। হাতেঠোঁটে নিখুঁত মনে করিয়ে দেয়ঃ যা বলে গিয়েছিলেন, কোনটা বাকী হয়ে গেল। সময় আছে, তাড়াতাড়ি চান করে নিন।

হেসে বলে, সবই তো পারলেন, রাঁধাবাড়া গোয়ালে। কাঞ্চন এসে রান্না করল। ওদের কল্যাণীর দাবার খাওয়াদাওয়া আয়োজন। বেড়ে হয়েছে, বড় সুন্দর বাস বেরিয়েছে।

কিন্তু দীনেশ সারারাত নির্ঘাত পরমহংস হয়ে গেছে। বলে, আপনারা খাবেন, আমার আজ সময় হবে না। তালা খুলুন অফিসের—কাজের জন্য এসেছি, তাই হোক।

তালা খুলতে গিয়ে মুশকিল হল, হাত কাঁপছে নিরঞ্জনের—চাবি ঠিক মতো তালার ভিতর ঢুকছে না। পা দুটোও কাঁপছে বোধহয়। অজয়দের প্রভাবপ্রতিপত্তি টাকাপয়সা আছে, হামেশাই সদরে যাতায়াত, পোস্টাপিসের বিরুদ্ধে তারা গোলমাল পাকিয়ে এসেছে। কোন এক সর্বনাশ করবে বলে এসেছে, ইনস্পেক্টর সেইজন্যে আজ খাতিরে ভিড়ছে না।

না, মিথ্যা আশঙ্কা। খাতাপত্র এগিয়ে দিতে একটুখানি উলটে-পালটে ঠিক অন্যান্য বারের মতোই দীনেশ খসখস করে সই মেরে দিল। মিনিট দশেকের মাথাই উঠে পড়ে বলে, চললাম পোস্টমাস্টারবাবু।

নিরঞ্জন কুণ্ঠিতভাবে বলে, বেলা অনেক হয়েছে। বড্ড আশা করে জিনিসটা তৈরী করলাম। সমস্ত হয়ে গেছে ভাত বেড়ে দিতে যেটুকু দেরি।

দীনেশ অপাঙ্গে একবার গোয়ালঘরের দিকে তাকিয়ে বলে, উপায় নেই মাস্টারবাবু। রাখালদার নেমন্তন্ন, ওঁদের ওখানে খেতে হবে।

এ বেলাটা কেন নেমন্তন্ন নিলেন? ভুলে গিয়েছিলেন বোধহয়।

মুখের জিনিস ফেলে যেতে নেই। ওদের বাড়ির খাওয়াটা রাত্রিবেলা না হয় হবে।

উঁহু, অপেক্ষা করছেন তাঁরা—

হাতঘড়ির দিকে চেয়ে দীনেশ ব্যস্ত হয়ে সাইকেলে চাপল।

অতএব বোঝা যাচ্ছে, রাখালরাজ আর ললিতা ভাইবোন দুয়ে মিলে কারসাজি করেছে। রাখালরাজের কাছে নিরঞ্জন দুঃখ করে বলেছিল, রাখাল ঘোরপ্যাঁচের মানুষ নয়। কোন ললিতা এসে পড়ে শুনে নিল। বাইরে-মানুষকে এর কাছ থেকে বঞ্চিত করা মরণতার পাপ এদের অর্থায়। অবশ্য ললিতা সত্যি সত্যি লোক করল জেঠাকে সামনে রেখে। তারা এর বলে বোধহয় প্রাণে অপমান বোধ হচ্ছে ললিতার। কী জানি কি বলেছে, কে জানে। রিপোর্ট করে পোস্টাপিসের সর্বনাশ না ঘটায়।

সকাতরে নিরঞ্জন বলে, ভাল নলেন গুড়েরও সন্ধান হয়েছে। ভাঁড় নয়, কলসি। নীলমণি আনতে গেছে। সুজনপুরে দুপুরে যখন খাচ্ছেন, গুড়ের কলসি নীলমণি এখানে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

দীনেশ আকাশ থেকে পড়ে: সে কি কথা! জিজ্ঞাসা করেছিলাম, গুড় পাওয়া যায় কিনা? শুধু একটা জিজ্ঞাসা। আপনারা ধরলেন, গুড় চেয়েছি আপনাদের কাছে। সরকারি কাজে আমি, সরকার মাইনে দিয়ে রেখেছে, কাজকর্ম সেরে চলে যাব। এর পর দেখছি এক গ্লাস তেষ্টার জলও এখানে খাওয়া চলবে না। কিছু নেওয়া যেমন দোষ, কিছু দিতে চাওয়াও দোষ তেমনি আপনাদের পক্ষে। তার জন্যে প্রসিকিউসন হতে পারে।

বলতে বলতে দ্রুত সাইকেল চালিয়ে ইনস্পেক্টর চোখের পলকে অদৃশ্য হল।

॥ নয় ॥

একদিন সাংঘাতিক ব্যাপার। ঠুনঠুন আওয়াজ তুলে নীলমণি ডাক এনে যথারীতি পোস্টাপিসে ফেলল। ব্যাগের শিলমোহর ভেঙে চিঠি বের করে পোস্টমাস্টার নিরঞ্জন টপাটপ সিল মেরে যাচ্ছে। তার পরেই একেবারে চুপ।

ডাকের ব্যাগ ফেলে নীলমণি বাড়িতে খাওয়া দাওয়া করতে গিয়েছিল। খাওয়া সেরে মাদুরে গড়িয়ে বেশ খানিকটা বিশ্রাম নিয়ে হেলতে-দুলতে আবার পোস্টাপিসে এসেছে। দেখে নিরঞ্জন চুপচাপ একভাবে টুলের উপর বসে আছে। পাষাণ হয়ে জমে গিয়েছে সে যেন।

নীলমণি ডাকে, অমনধারা বসে কেন নিরঞ্জনদা, কি হল?

নিরঞ্জন চোখ খুলে তাকাল। দু-চোখে জল টলমল করছে। কথা বলতে গিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

বলে, তুই ঠিক বলেছিলি নীলমণি, পরের চিঠি পড়া পাপ। পাপের শাস্তি পেতে হয়। আজকে আমার তাই হল। কিন্তু এত বড় শাস্তি আমি ভাবতে পারিনি রে।

স্তম্ভিত নীলমণি। কি মজা হাসিস্ফূর্তি করে বেড়ায় মানুষটা, সে আজ হাপুস নয়নে কাঁদছে। নীলমণি ভাবে অন্য কথা। কোন সাংঘাতিক গোলমাল উঠেছে বোধহয় পোস্টাপিস নিয়ে। সান্ত্বনা দিচ্ছে: মুসড়ে গেলে কেন? যায় যাবে পোস্টাপিস উঠে। আগে তো ছিল না, সে বরং নির্ঝঞ্ঝাটে ছিলাম। ভাল ভেবেই চিঠিপত্তোর তুমি পড়ো, মজা দেখবার জন্যে নয়। লোকে না বুঝল তো যাবে গে যাক চুলোয়।

বলতে বলতে থমকে গেল। যা সব বলে যাচ্ছে, সে জিনিস নয়। চিঠি একখানা নিরঞ্জনের চোখের সামনে—একখানা পোস্ট-

কার্ড। অত ছোট সামান্য জিনিসটা কোন শাস্তি বয়ে নিয়ে এলো যার জন্য নিরঞ্জন ছেলেমানুষের মত কাঁদছে। উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখে নীলমণি—পড়বার বিদ্যে নেই, কুচি কুচি কালো লেখাগুলো শতপদ সরীসৃপের মতো বীভৎস দেখাচ্ছে।

কি লেখা আছে নিরঞ্জনদা ?

জবাব দিতে যায় নিরঞ্জন। কথা বেরোয় না, গলার ভিতরে আটকে থাকে। তারপর যেন ধাক্কা দিয়ে চরম দুটো কথা বের করে দিল: বেণু নেই—

চড় চড় করে আকাশ ফেটে বজ্রপাত যেন। আবার কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে নিরঞ্জন বলে, কলেরায় মারা গেছে। আসল এশিয়াটিক। শেষরাত্রে হয়েছিল, দুপুরের মধ্যেই শেষ। সংকার-সমিতি ডেকে শেষকাজ করিয়েছে। মেস বদল করে চলে গিয়েছিল বেণু—এখানকার মেম্বাররা দুধসরের ঠিকানা জানত না, খুঁজে পেতে ঠিকানা যোগাড় করে খবর দিয়েছে।

থেকে থেকে বেণুর কথা বলে নিরঞ্জন। তার মেসে গিয়ে উঠেছিল—এই নতুন মেসে নয়, আগে যেখানটা থাকত। পোস্টাপিসের চাঁদা চাওয়া হয়নি বলে অভিমান করল, চাঁদা বলে দশ টাকা দিয়ে দিল; আর জলপাইগুড়ি অবধি গিয়ে কাল ঝঞ্ঝাট করে সাবজজবাবুর কাছে আদায় হল পাঁচটা টাকা। টাকা থাকলেই হয় না, অন্তঃকরণ চাই। দুধসর গাঁয়ের খাঁটি ছেলে একটি। খাঁটি বলেই বিপদ—ভগবান অমন ছেলেকে বেশিদিন ধুলোমাটির জগতে থাকতে দিলেন না। নিজের কাছে টেনে নিলেন।

পোস্টমাস্টার আর রানারে নিভৃত কথাবার্তা। চোখ মোছে দুজনে। সহসা নিরঞ্জন বলে, আমার পাপের শাস্তি—বুঝলি রে নীলমণি ?

নীলমণি ঘুণাক্ষরে জানল না, চুপিসারে নিরঞ্জন পাপ করে বসল—এটা কেমন করে হয় ? ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছে সে। পাপ নিরঞ্জন করতে পারে না। সমস্ত পারে, ঐ জিনিসটাই শুধু অসাধ্য তার পক্ষে।

নিরঞ্জন বলে, তুই সত্যি কথা বলেছিলি নীলমণি। পরের চিঠি পড়তে নেই। পড়া পাপ। তারই ফলভোগ হচ্ছে আমার। পিওন-মশায় সুজনপুর থেকে এসে যার নামের চিঠি তাকে ছুঁড়ে দিয়ে পাশায় গিয়ে বসতেন। আমারও ঠিক তাই এবার থেকে। চিঠিতে কি খবর, আমার তা নিয়ে গরজটা কি? চিঠি পড়ে কে কি করবে, সে ভাবনা আমি কেন করতে যাব? আমার কোন দায় পড়েছে?

নীলমণি রাগ করে বলে, তা বই কি! গাঁয়ের লোকের ভালমন্দ দেখবে না, চার টাকা মাইনের চাকরির জন্যেই তবে কি পোস্টাপিস গড়েছ?

ডাকের চিঠি পড়ার জন্য নীলমণি বরাবর ঝগড়া করে এসেছে, তারই মুখে আজ উল্টো কথা: পিওনমশায়ের কথা তুললে নিরঞ্জনদা, তিনি হলেন সুজনপুরের লোক, এখানে বলে মায়াদয়া কিছু নেই, তাঁর ছিল কেবল চাকরি। তিনি যা করতেন নিজের গাঁয়ের ব্যাপারে তুমি তা কেমন করে পারবে? হাতে করে গ্রামবাসীদের কোন জিনিসটা দিচ্ছ—বিষ কি অমৃত—না দেখে, পরখ না করে কক্ষনো দেওয়া যায় না।

তাই করতে গিয়েই সর্বনাশ! হাপানির টান টানেন শৈল-জেঠা। যমের সঙ্গে দড়ি টানাটানি—কে জেতে, কে হারে! আত্মা-রাম কোনরকমে দেহের মধ্যে ধরে রেখেছেন। এ চিঠি পড়ে সঙ্গে সঙ্গেই মাথা ঘুরে পড়বেন। একটি তো গেছে, আবার একজন যাবেন চলে। বিষ আমি কেমন করে জেঠার হাতে তুলে দিই?

কেন দেবে? দেখি—

দেশলাই-বিড়ি নীলমণি সর্বদা গাঁটে নিয়ে বেড়ায়। পোস্ট-কার্ডটা টেনে নিয়ে দেশলাই জ্বেলে দিল।

বলে, চিঠি পোড়াও বলে লোকে তোমার বদনাম দেয়। সেই কাজ আমি আজকে সত্যি সত্যি করলাম। অন্তর্যামী ঠাকুর দেখছেন, কাজটা ভাল কি মন্দ। বুড়োমানুষটা এমনিই তো যাবেন,

সিল মেরে আমি নিয়ে শৈল-জেঠার কাছে বিলি করে আসব। কাঞ্চনটা শয়তান, সে ফাঁকি ধরে ফেলবে। তার নজরে কিছুতে পড়া হবে না।

বুঝেছি এইবারে। নীলমণি ঘাড় নেড়ে বলে, আহা-মরি চাকরি তোমার নিরঞ্জনদা। এমনি তো শতেক দায় পোস্টাপিসের—খরচ-খরচার অন্ত নেই তার উপরে নতুন এই দশ টাকা এসে চাপল। মাইনে তো চার টাকা—বাড়তি টাকাটা কোথায় পাবে? আছে সান্নুদি বেওয়া বিধবা মানুষ, তার বাপ্ত ভেঙো। আবার কি!

নিরঞ্জন প্রবোধ দেয়ঃ শৈল-জেঠা কি আর চিরকাল থাকবেন। তিনটে চারটে মাস বড় জোর, শ্রাবণ-ভাদ্রের ওদিকে তিনি থাকতেই পারেন না। হাঁপানির শ্বাস টানতে টানতে চোখ উল্টে পড়বেন, দেখিস।

বিপন্ন কণ্ঠে সহসা বলে ওঠেঃ এ ছাড়া উপায়ই বা কি, বলতে পারিস? পোস্টাপিসের ভার নিয়েছি বলে তো নরহত্যা করতে পারিনে। ঐ চিঠি শৈল-জেঠার হাতে দেওয়া মানে বুড়ো মানুষটার বুকে ছোরা বসানো। কসাই নই আমি, সে আমি পারিনে।

বালিকা-বিদ্যালয়ে কাঞ্চন পড়ানোর কাজে যেতে আছে—ভাল রকম খোঁজখবর নিয়ে নিরঞ্জন সেই সময়টা শৈলধরের মনিঅর্ডার বিলি করে আসে। কাজ নির্ঝঞ্ঝাটে হয়ে যাচ্ছে। আফিম ও দুধের জোরে যমরাজের সঙ্গে লড়ালড়ি করে শৈলধরও বর্ষাকালটা মোটামুটি বিনা বিঘ্নে পার করে দিলেন। এবং শরৎও পার হয়ে যায়—

বিপদ অন্যদিকে—সান্নুদিকে নিয়ে। দশটাকার নতুন খরচা বৃদ্ধির জন্য সান্নুদির সুদের টাকা বাকি পড়ে যাচ্ছে। যখন তখন সেই সুদের তাগাদা। সর্বক্ষণ কলহ।

ধৈর্য হারিয়ে নিরঞ্জন একদিন ব্যাপারি ডেকে নিয়ে এলো। ধান বিক্রি করে সুদের দেনা শোধ করবে। গোলার চাবি খুলতে যাচ্ছে,

সানুদি ঝঙ্কার দিয়ে এসে পড়েন ঃ ধান বেচে দিয়ে সম্বৎসর খাবে কি শুনি ?

উপোস করব। তোমার কালো মুখ আর দেখতে পারিনে সানুদি। উপোস করে মরে যাবো—সে বরঞ্চ অনেক ভাল।

নীলমণি এসে পড়েছে কখন। সে এখন সানুদির পক্ষে। রাগ করে বলে, তুমি মরলে পোস্টাপিসও কিন্তু যাবে, সেটা খেয়াল রেখো। পোস্টমাস্টার বিহনে উঠে যাবে। চার টাকার চাকরি নরলোকে অন্য কেউ নেবে না।

নিরঞ্জন খিঁচিয়ে উঠল ঃ বেশ—বেচব না ধান, উপোসও করব না। অন্য উপায় তবে বাতলে দে।

উপায় নীলমণি ইতিমধ্যেই ভেবে নিয়েছে। সানুদিকে বলে, রাগারাগি কিসের ? সুদের টাকা তো শোধবাদ করে দিয়েছে নিরঞ্জনদা—

সানুদি অবাক হয়ে বলেন, ওমা, কবে ? টাকা হাতে পেলাম না —মুখের কথা বলে দিলেই হল বুঝি ?

হাতে পাবে কেমন করে? সে টাকা সঙ্গে সঙ্গে আবার নিরঞ্জনদাকে কর্জ দিয়ে দিয়েছ। ধরে নাও না তাই। টাকা বাক্সে পুঁজি করে মুনাফা নেই, যত খাটাবে তত লাভ। তোমার তাই হয়েছে সানুদি, সুদের টাকা খাটছে। হাতে পৌঁছানোরও ফুরসত হল না।

সুদের টাকারও সুদ হবে তাহলে ?

অকূল সাগরে কূল দেখতে পেয়ে নিরঞ্জন বলে উঠল, আলবৎ। কড়ায় গণ্ডায় হিসেব করে নিও তুমি, একটি পয়সাও ছাড় কোরো না। এই বলা রইল।

একটু ভেবে নিয়ে সানুদি সংশয়ের সুরে বলেন, যা কাণ্ড তোর। ওই সুদই দিতে পারিসনে। সুদের সুদ হলে তখন আরো তো মোটা অঙ্কের হবে। দিবি কেমন করে ?

নিরঞ্জন দরাজ ভাবে বলে, না দিতে পারি সুদের সুদেরও সুদ বাড়বে তখন। চক্রবৃদ্ধি হারে চলবে। মজা তোমার সাতুদি, সুদের পাহাড় জমে যাবে।

পাহাড়ের মালিক হবার সম্ভাবনায় সাতুদি চুপ করে যান।

সাতুদিকে নিরস্ত করা গেল, কিন্তু উদ্বেগ বাড়ছে শৈলধরকে নিয়ে। শরৎকালও যায় যায়, শীত পড়বে এইবার। বর্ষার মধ্যেই চোখ উলটে পড়বেন আন্দাজ করা গিয়েছিল। ক্রমশ বিপরীত অবস্থা এসে যাচ্ছে। গৃহ-ছায়ায় বিনা কাজে অনড় হয়ে বসে থাকা এবং আফিমের অনুপান হিসাবে সেরখানেক করে খাঁটি গোদুগ্ধ পান করা —উভয় কারণে স্বাস্থ্যোন্নতি হয়ে ভুঁড়ির লক্ষণ দেখা দিচ্ছে। আরও কত বর্ষা কত শীত পার করবেন আন্দাজে আসে না।

কী মুশকিল রে বাবা! পোস্টমাস্টার রানার দুজনেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। মৃত্যুসংবাদ কতদিন চেপে রাখা যাবে? দিনের ব্যাপারও নেই আর এখন—কত মাস, কত বছর? এবং যত মাস যত বছরই হোক, মাসোহারার টাকা মাসে মাসে জুগিয়ে যেতে হবে। অব্যাহতি নেই।

নীলমণি ক্ষিপ্ত হয়ে বলে, কামারের হাপরের মতো দিনরাত্তির সাঁ-সাঁ করে শ্বাস টানছেন। কোন সুখে বেঁচে থাকেন, বুঝিনে বাবা। দেখা যাক মাঘ অবধি। অত শীতেও যদি না মরেন লাঠির ঘায়ে মাথা ফাটিয়ে আসব। তবু তো পুত্রশোক পেতে হবে না বুড়োমানুষটার।

বেণুধর চিঠি লেখে না, শৈলধরের তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই। মাঝে মাঝে মনিঅর্ডার পেয়ে তিনি তৃপ্ত। ছেলে নিশ্চয় ভাল আছে এবং ভাল ভাবে কাজকর্ম করছে। নয় তো ঘড়ির কাঁটার মতো এমন নিয়মিত মনিঅর্ডার করে কি করে।

কিন্তু কাঞ্চনের রকম আলাদা। তার চাই চিঠি। টাকা না-ই পাঠাল বেণুধর—সে কাঞ্চন যেমন করে হোক চালিয়ে নেবে। চিঠি দেয়নি দাদা তাকে কতকাল!

নিরঞ্জন যথাসম্ভব পাশ কাটিয়ে বেড়ায়, মুখোমুখি পড়তে চায়

না। তবু একদিন দেখা হয়ে গেল। বড় বড় চোখ দুটো তুলে কাঞ্চন কটমট করে নিরঞ্জনের দিকে তাকায়।

টাকা ঠিক এসে যাচ্ছে, চিঠি আসে না কেন দাদার ?

হেন অবস্থায় থতমত খাওয়া চলে না। নিরঞ্জন একেবারে উড়িয়ে দেয় : আমি তার কি জানি ?

জানেন সমস্ত। আমিও জানি কি জন্য চিঠি আসে না।

কলকাতায় কত চেনাজানা, আসল ব্যাপার আবিষ্কার করে ফেলা অসাধ্য নয় কাঞ্চনের পক্ষে। তবু কতদূর কি জেনেছে ও-ই বলুক, নিরঞ্জন চুপ করে রইল।

কাঞ্চন বলে, আজকাল দাদা যা লিখছে সে জিনিস আপনার অপছন্দ। মতামত আমাদের জানতে দিতে চান না, চিঠি তাই গাপ করে ফেলেন।

সর্বনেশে রে বাবা! আন্দাজি ঢিল ছুঁড়ছে। অতএব নিরঞ্জনেরও তেজ দেখাতে বাধা নেই। বলে, হুঁ, অনেক জিনিস জানো তুমি দেখছি। আমার চেয়ে অনেক বেশি।

চিঠিতে দাদা কী লেখে, তা-ও জানি। বিজয় সরকারের সঙ্গে বিয়েয় এদ্দিনে মত দিয়েছে। মা-বুড়ি কাশীবাসী হল, বনপাণের ল্যাঠা চুকেবুকে গেছে, এখন আর কোন অজুহাতে বাবাকে ঠেকাবে ? কিন্তু বড়লোকের বাড়ি বউ হয়ে যাবো, হিংসে যে আপনার। চিঠি পুড়িয়ে ফেলেন, দাদার মতামত যাতে বাবার হাতে না পড়ে। এমনি করে যদ্দিন দেরি করানো যায়।

বলে যাচ্ছে কাঞ্চন। একেবারে নতুন খবর এসব। গাঁয়ের মধ্যে থেকেও নিরঞ্জন কিছু জানে না। অথচ গাঁ নিয়ে এত তার দেমাক! খবর তাজ্জব বটে—বিজয় উৎকট রকম প্রেমে পড়েছে।

অসুস্থ শৈলধরের খোঁজখবর নেবার অছিলায় প্রায় সর্বক্ষণ বিজয় তাঁর কাছে পড়ে থাকে। ঠাকুরদেবতার কাছে হত্যে দেবার মতন। শৈলধরকে দিয়ে একপাতা চিঠি লিখিয়েছে কলকাতায় বেণু-

ধরের নামে। কথা একটি মাত্র ঃ কাঞ্চনে আর বিজয়ে বিয়ে দিতে চাই, সানন্দে তুমি সম্মতি দাও। মা জয়মঙ্গলা কাশীবাসী হয়েছেন, নিজের অভিভাবক বিজয় এখন নিজেই, অতএব পরম সুযোগ এসেছে। গ্রামবাসীদের মধ্যে ধনে-জনে ওরাই সকলের সেরা। কুটুম্বিতা হলে মস্তবড় সহায় হবে আমাদের—ইত্যাদি ইত্যাদি। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কথা মোটের উপর এই একটি।

এমন চিঠি সম্পর্কে নিরঞ্জনকে বিশ্বাস করা চলে না। বিজয় তাই সুজনপুর অবধি গিয়ে সেখানকার ডাকবাক্সে নিজ হাতে ফেলে এসেছে। কিন্তু কোনো চিঠির জবাব নেই।

বলতে বলতে কাঞ্চন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে নিরঞ্জনের উপর। চিঠি না হয় সুজনপুর হয়ে দাদার কাছে পৌঁছে গেল। কিন্তু জবাব তো আপনার হাত দিয়ে আসবে। পোস্টাপিসে আপনি থাকতে কোনোদিন জবাব আসবে না। আসে না বলেই তো আরো নিঃসন্দেহ, দাদার এখনকার মতটা কি।

নিরঞ্জন অবাক হয়ে শোনে। অজয়ের বউয়ের সঙ্গে শাশুড়ি জয়মঙ্গলার বনিবনাও নেই। কর্তা কাশীবাসী হওয়ার পর যখন তখন জোর কলহ বাধে, বউ যাচ্ছেতাই শোনায়, দমে কুলায় না বলে বুড়ি শাশুড়ি সমুচিত শোধ দিতে পারেন না। শেষটা একদিন জয়মঙ্গলা ঈশ্বর ও স্বামী-সঙ্গ লাভের জন্য কাঁদতে কাঁদতে কাশী রওনা হয়ে গেলেন। সাধ ছিল, বিজয়ের বিয়ে দিয়ে বরপণ বরসজ্জা এবং আপাদমস্তক গয়নাগাঁটিতে-সাজানো বউ ঘরে তুলে ছোট ছেলের স্থিতি করে দিয়ে যাবেন—সেই অবধি সবুর করতে দিল না বড়বউ. যেন তাড়িয়ে বের করল।

সকলে যেমন, নিরঞ্জনও বৃত্তান্ত জানে এই অবধি। তার পরেও ভিতরে ভিতরে এত চলছে—শৈলধরের কাছে বিজয়ের তদ্বির, এত সমস্ত চিঠিচাপাটি মৃত বেণুধরের নামে—

কাঞ্চন বলে উঠল, চিঠির জবাব দাদা যদি রেজেস্ট্রি করে পাঠায়,

আপনার হাত থেকে তবেই ছাড় পাবে। সেইটে ওঁরা কেন যে এদ্দিন বাতলে দেননি তাই ভাবি।

বিজয় সরকারের সম্পত্তি ও টাকাকড়ি আছে কিন্তু বিত্তেয় তো নিরঞ্জনেরই দোসর। কমই যাবে, বেশির দিকে কদাপি নয়। শহুরে অভ্যাস, টাকা ওড়াতে পেলেই এরা খুশি। তবু একটু বাজিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে নিরঞ্জনের। বলে, বিজয় রাজী. শৈল-জেঠা এক-পায়ে খাড়া। আর মেনে নিলাম, বেণুরও মত ঘুরে গেছে। কিন্তু তুমি তো দুধসরের আর দশটা মেয়ের মতন নও। তোমার নিজের একটা মতামত আছে, জাহির করে বেড়াও—

কাঞ্চন বলে, আছেই তো। মত না থাকলে ঝগড়া করতে আসব কেন? ভাল খাব ভাল পরব, কোঠাঘরে গদির বিছানায় থাকব। মত কেন হবে না বলতে পারেন, এর বেশি মেয়েরা কি চায়? কলকাতায় বাপের সঙ্গে থাকত বিজয়, শহুরে গন্ধও গায়ে খানিকটা আছে—

সহসা প্রশ্ন করে বসে, আচ্ছা আপনার মতটা কি শুনি। সম্বন্ধ অন্য কিছু মনে আসে তো বলুন।

মেয়েছেলের বেহায়াপনায় নিরঞ্জন হকচকিয়ে যায়। ভাল মন্দ জবাব দেয় না। নাছোড়বান্দা কাঞ্চন বলে, আহা বলুন না। পাত্র হিসাবে বিজয় সরকার কি খারাপ? ভাল কে আছে তবে গাঁয়ের মধ্যে?

নিরঞ্জন মিনমিন করে জবাব দেয়: না, খারাপ কেন হতে যাবে? ভাল বই কি—

একটু ভেবে নিয়ে জোর দিয়ে বলে, খুব ভাল। বালিকা-বিদ্যালয় নিয়ে আর ভয় রইল না। বিজয় এমন-কিছু লেখাপড়া জানে না যে কাজকর্মের দায়ে বাপের মতন শহরে গিয়ে বাসা করবে। বউ হয়ে তুমি এই দুধসরেই থাকবে চিরকালের মতন। কলকাতার ভূত কাঁধ থেকে নেমে পালাবে।

সচকিত হয়ে কাঞ্চন বলে, ভূত কাকে বলছেন ?

দুধসরের মেয়ে। কলহ করুক গালি দিক দুধসরের মানুষ বলেই নিরঞ্জনের অতি-আপন। তাকে সতর্ক করা উচিত বই কি। বলে, চেহারায় কাপড়চোপড়ে রাজপুত্তুর, কিন্তু মানুষ হিসাবে অতি ছ্যাঁচড়া।

কঠিন স্বরে কাঞ্চন প্রশ্ন করে, কার কথা বলছেন, খুলে বলুন।

একজন দুজন তো নয়—

এমনি বলে নিরঞ্জন পাশ কাটাবার তালে ছিল। আবার ভাবল, কিসের পরোয়া! নিজের স্বার্থেই কাঞ্চনের জেনে বুঝে রাখা উচিত। বলে, কত দিকের কত জনা আছে। একটার কথা জানি, রানী-শঙ্করী লেনের ভূত—

আর যাবে কোথা! কেউটেসাপের মতো ফণা তুলে ওঠে যেন কাঞ্চন। গর্জন করে উঠল: তবে, তবে? আপনি জানলেন কি করে রানীশঙ্করী লেনের কথা? তবে যে চিঠি খুলে পড়েন না, নষ্ট করেন না চিঠি। দাদার চিঠি, আর কলকাতা থেকে আরও যত চিঠি আসে সমস্ত আপনি গাপ করেছেন। ভেবেছেন কি মনে মনে— জেলের কয়েদির মতো আটক করে রেখে যা-ইচ্ছে তাই করবেন? তেমনধারা প্যানপেনে মেয়ে পাননি আমায়।

বলতে বলতে কণ্ঠরোধ হয়ে যায়—হয়তো বা কান্নায়। ঝড়ের মতো কাঞ্চন ছুটে গেল। ভূত ছেড়ে যায়নি তবে তো? ভূতেই করাচ্ছে।

॥ দশ ॥

পিওনমশায়দের বড় বিপদ। মা-শীতলার অনুগ্রহ। সুজনপুরে নিজের বাড়িতেও নয়—শ্বশুরবাড়ি, ভিন্ন মহাকুমার এক গণ্ডগ্রামে। শালার মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে বাড়িসুদ্ধ সেখানে চলে যান। রাখাল-রাজের কাঁধে পোস্টাপিসের দায়িত্ব, বিয়ের দিনটা এবং পরের দিন বরকনে বিদায়ের সময় পর্যন্ত কাটিয়ে সে সুজনপুর ফিরে এলো। কাগজপত্রে সই করে গিয়েছিল—কেরানিবাবু এবং নিরঞ্জনের উপর ছটো দিনের কাজকর্ম দেখে দেবার ভার। নিরঞ্জন ডাকের সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে আবার এখানকার চেয়ারে বসেছে, বাড়ি পাহারা দিয়ে ঐ ছটো রাত্রি সুজনপুর কাটিয়ে গেছে।

রাখালরাজ ফিরল, অন্য সকলে রয়ে গেলেন। দীর্ঘকাল পরে—প্রায় অন্তিম বয়সে অটলের শ্বশুরবাড়ি যাওয়া—ললিতারও ইতিমধ্যে মামীদের সঙ্গে খুব ভাব জমে গেছে। অটলের কাছে এসে তারা ধরাধরি করেঃ শাশুড়ি ঠাকরুন নেই—তা ক'টা দিন থেকেই দেখুন না, আমরা আদরযত্ন করি না ঠেঙার বাড়ি মারি।

থেকে যেতে হল অতএব। দিন দশ-পনের কাটিয়ে ঘরের মানুষদের ঘরে ফেরবার কথা—সে জায়গায় দিনের পর দিন কেটে যায়, মাসের পর মাস। মা-শীতলার অনুগ্রহ, অর্থাৎ বসন্ত। গোড়ায় অটলকে ধরল। ও রোগ একজনের হয়ে রেহাই দেয় না। অটল আরোগ্য হতে না হতেই এক সঙ্গে একেবারে তিন-চার জনে পড়ল—তার মধ্যে রাখালরাজের স্ত্রী বীণা। চলল এই রকম—কেউ বুঝি আর বাদ থাকবে না।

সুজনপুরের বাড়ি একলা রাখালরাজ খবর শুনে ছটফট করছে। সরকারি দায়িত্ব ফেলে বারম্বার পালানো ঠিক নয়—কতদিনে ফিরতে পারবে ঠিক কি—কোন রকম গণ্ডগোল ঘটলে জেল পর্যন্ত হতে

পারে। হেড-অফিসে ছুটির জন্য লিখে পথ তাকাচ্ছে, অস্থায়ী লোক এসে পড়লে পালাবে। এলো সে মানুষ অবশেষে। কাজকর্ম বুঝিয়ে দিয়ে, এবং বাড়ির দেখাশুনার ভার নিরঞ্জন ও নীলমণির উপর ফেলে রাখালরাজ মামার বাড়ি ছুটল। গিয়ে দেখে আর সকলে একরকম সামলে উঠেছে। সর্বশেষ ললিতাকে ধরেছে এবার। শক্ত রকম ধরেছে তাকে, সকলের চেয়ে সাংঘাতিক।

ফিরতে তারপর আরও একমাস। রাখালরাজকেও ধরেছিল। তবে তার পানিবসন্ত—মা-জননী ছুঁয়ে গেলেন এই পর্যন্ত। বাড়ি ফিরে ঢাকঢোল বাজিয়ে পাঁঠা বলি দিয়ে জাঁকিয়ে শীতলা ঠাকরুনের পুজো দিল। প্রাণে প্রাণে যাহোক করে ফিরেছে, দেহ ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। ধাক্কা পুরোপুরি সামলে উঠতে এখনো বিস্তর দিন লাগবে। পোস্টাপিসের চেয়ারে গিয়ে বসে এখন রাখাল, কোন রকমে কাজকর্ম চালিয়ে যায়।

নীলমণি একদিন ডাকের ব্যাগের সঙ্গে আলাদা এক খামের চিঠি নিরঞ্জনের হাতে এনে দিল। রাখালরাজ লিখেছে। সন্ধ্যার পর আজকেই যেন নিরঞ্জন ভাক্তি অবশ্য সুজনপুর চলে আসে। বিষম বিপদ।

উদ্বিগ্ন হয়ে নিরঞ্জন বলে, এখানে এসেও ধরল নাকি? বসন্ত একবারের বেশি দুবার হয় না—ওদের বাড়ির সবাই তো ভুগে উঠেছে।

নীলমণি চটেমটে বলে, হয়েছে তোমার এবারে। এত করে বলি, মাতব্বরি করে তো কেবলই খরচান্ত—এক ফেরে পড়ে গেছ, মাসে মাসে দশটাকা গুণাহ্‌গারি দিয়ে যাচ্ছ শৈল-জেঠাকে। কদ্দিনে ছাড়ান পাবে, ভগবান জানেন। পিওনমশায় চল্লিশ বছর হেসে খেলে একটানা কাজ করে গেলেন। একটি কথা কেউ কোনোদিন বলতে পারল না। সেই নিয়মে কাজ করে যাও—মাথা

ভাঙাভাঙি করেছি, কানে নিলে আমার কথা? ঠেলা সামলাও এইবারে।

অধীর উৎকণ্ঠায় নিরঞ্জন বলে, কি হয়েছে বলবি তো আমায় খুলে?

নীলমণি বলে, রানার মানুষ—আমার কাছে বেশি কি বলতে যাবেন? বললেন, জরুরী ব্যাপার। চিঠি দেবে আর মুখেও বলবে, সন্ধ্যের পর অতিঅবশ্য যেন চলে আসে। শুনলাম তারপর বোনটার কাছে। চলে আসছি, সেই সময় হাতছানি দিয়ে ডাকল। আহা, মা-শীতলা কী চেহারা করেছেন—মুখের দিকে চাওয়া যায় না। বলে, তোমাদের পোস্টমাস্টার বাবুর যে চাকরি থাকে না। গাঁয়ের মানুষ দরখাস্ত করেছে।

নিরঞ্জন বিশ্বাস করে না: দুধসরের মানুষ আমার নামে দরখাস্ত করতে যাবে—হতে পারে না।

নীলমণি বলে, ললিতা কি মিছে কথা বলল? ভাল মেয়ে—ছল চাতুরীর সে ধার ধারে না। তা হলেও সুজনপুরের মেয়ে যখন, আমি কেন খাটো হবো তার কাছে? ডঙ্কা মেরে জবাব দিলাম: চাকরি না থাকে তো বয়ে গেল। নিরঞ্জনদা পরোয়া করে না। মাইনে যা, চাকরির দরুন খরচখরচা তার তিন-চারগুণ!

নিরঞ্জনকে কিন্তু চিন্তান্বিত দেখাচ্ছে।

নীলমণি বলে, বড় মিথ্যেও বলিনি ভেবে দেখ। চাকরি গেলে আপদ যায়, ধান বিক্রি করে তখন আর সাধুদির মুখঝামটা খেতে হবে না।

নিরঞ্জন বলে, কিন্তু নতুন পোস্টমাস্টার পাবি কোথায় তোরা? পায়ে ধরে সাধলেও কেউ চাকরি নেবে না। পোস্টমাস্টার অভাবে তুলে দেবে আপিস। আমি কেবল তাই ভাবছি। দরখাস্তে পোস্টাপিস হয়েছে—দুধসরের মানুষ এত আহাম্মক কে আছে, দরখাস্ত করে সেই জিনিস আবার তুলে দিতে যাবে?

সেইসব দেখাবেন হয়তো। সেই জন্যে ডাক পড়েছে। দেখে চক্ষু সার্থক করে এসো। কাঞ্চনে আর বিজয়ে বড় ফিসফিসানি। আমার চোখ এড়ায় না। বিয়ে হবে নাকি দুটোয়—ভাবলাম, তারই ফষ্টিনষ্টি। পালের গোদা ওরাই, এবারে বুঝতে পারছি। যাচ্ছ যখন সুজনপুর, পরখ হয়ে যাবে। যা বললাম, দেখে এসো তাই কিনা।

রাখালরাজ বারান্দায় বসে পথ তাকাচ্ছিল। বলে, শরীর দুর্বল, অন্যদিন এতক্ষণ শুয়ে পড়ে বিশ্রাম নিই। তা হতে দেবে তোমরা? আমার জীবন শেষ না করে ছাড়বে না। কী সব কাণ্ড করেছ— সুপারিনটেণ্ডেণ্টের কাছে দরখাস্ত করেছে তোমার গ্রামের লোক। একগাদা নালিশ।

নিরঞ্জন মরমে মরে যায়। দুধসরের মানুষ বিরুদ্ধে গেছে, এমন কথা শুনতে হল সুজনপুরবাসীর কাছে। হোক রাখাল পরমসুহৃৎ, তবু সুজনপুরের লোক তো বটে।

রাখাল বলে, দীনেশ এসেছে, তার উপরে এনকোয়ারির ভার। কাল বিচার তোমার—দুধসর গিয়ে লোক-ডাকাডাকি হবে। দরখাস্তে যাদের সই, ডাকিয়ে এনে তাদের মুখে শুনবে। বলি, মানুষটা তো হাঁদারাম—চটেমটে গিয়ে দশের মধ্যে কি বলতে কি বলে বসবে, রাত্রে নিরিবিলি একটু গড়োপিটে দেওয়া উচিত। দীনেশও বলল, হ্যাঁ! দিনমানে নয়, সন্ধ্যের পর। সেই জন্য তোমায় আসতে লিখলাম।

নিরঞ্জন জিজ্ঞাসা করে, কোথায় ইনস্পেক্টরবাবু।

কাজে আছে। আবার কি! বাবা উপস্থিত থাকতে সময়ের অপব্যয় হতে দেবেন? খেলার ব্যাপারে বাবার কাছে বয়সের বাছবিচার নেই। দীনেশের আজকে তত ইচ্ছে ছিল না, বাবাই জোর করে ধরে বসালেন।

দুজনে ঘরে ঢুকল। হেরিকেন পাশে রেখে কাজের মধ্যে ঘোরতর নিমগ্ন দীনেশ আর অটল-পিওন। দাবায় বসেছেন। খুটী-

পতনও কানে শোনা যাবে, এমন নিঃশব্দ।

রাখালরাজ বলে, নিরঞ্জন এসে গেছে দীনেশ। ওঠো এইবার।

হুঁ—বলে ঘাড় তুলে দীনেশ একবার দেখে আবার চাল ভাবতে লাগল।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে রাখাল তাগিদ দেয়ঃ একটিবার উঠে কাজটুকু সেরে দাও। ফিরে যাবে তো বেচারি এতখানি পথ।

বিরক্ত ভাবে দীনেশ এটাচিকেস ছুঁড়ে দিলঃ দরখাস্ত ওর ভিতরে। পড়ে নিনগে ভালো করে। জবাব ভাবতে লাগুন। যাচ্ছি আমি।

দরখাস্ত বের করে নিয়ে দুজনে আবার বারান্দায় গেল। নিরঞ্জন সর্বাগ্রে নামগুলো দেখে। প্রথম নাম কাঞ্চনমালা ঘোষ। ঠিক ধরেছে নীলমণি—লেখাপড়া না জানুক, হাবেভাবে মানুষ বুঝতে তার জুড়ি নেই। কাঞ্চনের নিচেই বিজয়চন্দ্র সরকার। তার নিচে অজয়। সরকারদের গোমস্তা ও মাহিন্দারগুলোর নামও পর পর চলল। জন চারেক অনুগত-আশ্রিতের নাম রয়েছে। সর্বশেষ খেয়াঘাটের মাঝি—

হি-হি করে হেসে ওঠে নিরঞ্জনঃ এই মাঝি বেটাকে হাজির করাব কাল। করাবই। ডাকের চিঠির কেমন চেহারা, খেতেই বা কি রকম লাগে—মিষ্টি না ঝাল, এই সব জিজ্ঞাসা করব। ইনস্পেক্টরের মুকাবেলা জিজ্ঞাসা করব। কী জবাব দেয়, শোনা যাবে।

সর্বসাকুল্যে তেরো জন। লিষ্টি দেখে নিরঞ্জনের সব দুঃখ জল হয়ে গেছে। বুকে থাবা মেরে বলে, তাই তো বলি দুধসরের লোক হয়ে আমার পিছনে লাগতে যাবে! গোড়ার ঐ দুটো নাম—নীলমণি ঠিকই ধরেছে, শয়তানি ঐ দুজনের। দুধসরের আসল মানুষ নয় ওরা, দৈবাৎ উড়ে এসে পড়েছে। খাঁটি দুধসরের হলে এমন পারত না—কলকাতার আমদানি।

রাখালরাজ আপত্তি করে বলে, দুজন কেন বলো, করেছে এক

জন্যেই। কাঞ্চনমালা ঘোষ। কাঞ্চনের সুপারিশে. হাতের লেখা আগাগোড়া কাঞ্চনের—ওর এই নাম সইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেখ না। এখন কিছু নয়—ঝঞ্চাট চুকেবুকে গেলে এর শোধ নিও। বিয়ে দিয়ে ধুমসিটাকে গ্রাম-ছাড়া কোরো। দেখবে, চতুর্দিক ঠাণ্ডা।

নিরঞ্জন বলে, বিয়ে তো হবেই—পরের নাম যার, ঐ বিজয়ের সঙ্গে। ব্র্যাকেটে কাজকর্ম আগে থেকেই। কিন্তু গ্রাম-ছাড়া হবে না—মেয়ে ছিল, বউ হয়ে আরও এঁটে বসবে। সেটা কিছু খারাপ নয়। এমনি যা-ই হোক, পড়ায় সত্যি ভালো। চেষ্টাচরিত্র করে বালিকা-বিদ্যালয় এরই মধ্যে দিব্যি জমিয়ে তুলেছে।

মূল-দরখাস্ত দেখছে এবারে। দফায় দফায় অভিযোগ। নতুন কোনটাই নয়। চিঠিপত্র ঠিক মতো বিলি হয় না, বহু চিঠি নষ্ট করে ফেলে (এই সেদিনও একটা নষ্ট করেছি কাঞ্চন। বেণুর মেসের লোক শৈল-জেঠার নামে যে চিঠি পাঠিয়েছিল)। যত চিঠি ডাকবাক্সে পড়ে, তার মধ্যেও বাছাই করে পাঠায় (কী করি ! বালিকা-বিদ্যালয় অকূলে ভাসিয়ে ফুড়ুত করে তুমি যে উড়ে পালাতে চাও)। একের চিঠি অন্যের ঠিকানায় বিলি করে, যার জন্যে ক্ষতি-লোকসান হয় মানুষের (ক্ষতি-লোকসান অজয়-বিজয়ের, হারাধন ধাড়া রক্ষে পেয়ে গেল আমার সেই ভুলটুকুর জন্য)। খাম-পোস্টকার্ড প্রায়ই থাকে না পোস্টাপিসে; ফুরিয়েছে জানালেই আগের মূল্য শোধ করে দিতে হবে, কিন্তু ক্যাশ-ভাঙার দরুন মূল্য-শোধের উপায় থাকে না (ক্যাশ-ভাঙা নয়, ধারবাকি খদ্দেরের কাছে। দায়ে-বেদায়ে সব চিঠি লেখাতে আসে, শখের চিঠি একটাও নয়—নগদ পয়সা নেই বলেই হাঁকিয়ে দিতে পারিনে। দুঃসময়ের মানুষ তারা, হাঁকিয়ে দেওয়া যায় না)।

আরও আছে। আজেবাজে সেগুলো। দরখাস্ত বড় করার জন্য লিখেছে। যেমন : পোস্টাপিস খোলার কোন নির্দিষ্ট সময় নেই (ঘড়ি ধরে পোস্টাপিস খুলিনে, তা ঠিক। পাব কোথায় ঘড়ি ?

ঘড়ির তোয়াক্কা রাখিনে আমরা পাড়াগাঁয়ের লোক। ঘড়ি ক'জনার আছে শুনি। কলকাতার বাবু-মেয়ে ছিলে কাঞ্চনমালা—সেই আমলের পুরনো ঘড়ি তোমারই একটা থাকতে পারে। যেমন: আলাদা ঘর নেই পোস্টাপিসের, সরকারি অফিস বলে চেনাই যায় না। পোস্টমাস্টার নিরঞ্জনের ঘরের দাওয়ায় অস্থায়ী বেড়া বেঁধে কাজ চলছে। চোর-ডাকাতে ইচ্ছে করলেই বেড়া ভেঙে ফেলতে পারে। (পারেই তো বেড়া ভাঙতে। কিন্তু ভাঙতে যাবে কোন লোভে—ভেঙে তো ফুলো-ভুমর! বাগে ভরে পাঠিয়েছিলে, মনে নেই রাখাল?)

দাবাখেলা শেষ করে উঠে ইনস্পেক্টর দীনেশ এতক্ষণে বাইরে দেখা দিল। সে-ও হাসে: ওরে বাবা, এখনো যে পাঠ চলেছে! চাকরি তো চার টাকার, তার বিরুদ্ধে আস্ত একখানি মহাভারত! যাদের নাম সই আছে, তদন্তের সময় কাল সকলকে ডেকে দাবড়ি দিয়ে আসব আচ্ছা করে। চিঠি পড়ে তো কি হয়েছে—চোখ থাকলেই পড়ে থাকে, যারা কানা আর যারা নিরক্ষর তারাই কেবল পড়ে না। হাতের উপর দিয়ে কোন জিনিসের চলাচল, উঁকি না দিয়ে পারা যায় নাকি? এতই যদি আত্মসংযম থাকবে, তবে তো পোস্টমাস্টার না হয়ে সাধু পরমহংস হবার কথা। চার টাকা মাইনের বদলে খাঁটি পরমার্থ।

নিরঞ্জনকে বলে, দরখাস্ত তো পড়লেন, জবাব কি হবে রাখালের কাছে থেকে ভাল করে শিখে পড়ে নিন। রাখালকে আমি বলে দিয়েছি। কষ্ট দিয়ে এই জন্যে আপনাকে নিয়ে এসেছি। গায়ে হাত দিয়ে ভাবনার কিছু নেই। মাকড় মারলে ধোকড় হয়। মোটের উপর ভেড়েফুঁড়ে সকলের সামনে বেকবুল যাবেন। কিছু সাফাই-সাক্ষি ঠিক করে রাখবেন যদি সম্ভব হয়ে ওঠে।

নিরঞ্জন সগর্বে বলে, সম্ভব হবে না কি বলছেন। ভুবনের আপামর-সাধারণ আমার পক্ষে। এরাই কজন উড়ো আপদ—

হুধসরের আদি-বাসিন্দা নয়। গাঁয়ের উপর সেইজন্যে মায়া নেই।

ও বউদি, ও ললিতা, সাড়াশব্দ পাইনে যে। রাগ করে শুয়ে পড়লেন? দাবা তুলে ফেলেছি, ভাত-টাত দিয়ে দিন এইবারে।

বলতে বলতে দীনেশ পেয়ারাতলায় কুয়োর ধারে মুখ-হাত ধুতে গেছে। বাড়ির ছেলে হয়ে গেছে একেবারে। কথাবার্তা তেমনি, চলাফেরা সেইরকম।

নিরঞ্জন নিম্নস্বরে বলে, বড্ড স্ফূর্তি যে! দাবায় জিত হয়েছে। নিশ্চয়ই।

মুখ টিপে হেসে রাখালরাজ বলে, আরও ঢের ঢের বড় জিত। বিয়েটা অনেক দিন ধরে ঝুলছিল। দীনেশের মা-বাপের আপত্তি। দরখাস্তের এনকোয়ারিতে দীনেশ আজ এখানে, আবার আজকের ডাকেই তার বাপের চিঠি এলো, বিয়েয় সম্পূর্ণ মত দিয়েছেন তিনি, এক-পয়সা দাবি-দাওয়া নেই। সারা বিকাল তাই পাঁজি দেখা হয়েছে। আসছে মাসে শুভকর্ম।

আবার বলে, দীনেশ আজ মাটিতে হাঁটছে না, উড়ে উড়ে ভাসছে। জোর কপাল তোমার, মামলা ফুঁয়ে উড়িয়ে দেবে।

॥ এগার ॥

সেই রাত্রি। চৌরি ঘর, মাটির দেয়াল, গোলপাতার ছাউনি—দীনেশ ঘুমুচ্ছে ঘরের মধ্যে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়, দরজায় টোকা দিচ্ছে কে যেন। প্রথমটা ভেবেছিল বাতাসে পুরনো দরজা ঢকঢক করছে। কান পেতে নিঃসন্দেহ হল, মানুষের আঙুলের টোকা।

নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে প্রশ্ন করে, কে?

বাইরের ফিসফিসানি: দরজা খুলুন। আমি, আমি। চেঁচাবেন না।

স্ত্রীকণ্ঠ। রহস্যময় লাগে। হেরিকেনের জোর কমানো ছিল, জোর বাড়িয়ে দীনেশ দরজা খুলে দিল। কে জানত এত জ্যোৎস্না আজ বাইরে। নিশিরাত্রি নয়, যেন দিনমান। দোরগোড়ায় ললিতা, চিনতে মুহূর্তকাল দেরি হয় না।

দরজা খুলে দিতে সাঁ করে ললিতা ঘরে ঢুকে পড়ল। দরজা ভেজিয়ে দিল।

দীনেশের বুক ঢিবঢিব করছে। ললিতার মতো মেয়ের সম্বন্ধে এ জিনিস স্বপ্নেও ভাবা যায় না। এত দিনের আসা-যাওয়া, নিরিবিলি তাকে একটা মিনিট কাছাকাছি পায়নি। রাতদুপুরে আজ ঘরে এসে উঠল। বিয়ের কথা মোটামুটি পাকা, হঠাৎ তাই এতখানি সাহস! কী কাণ্ড না জানি করে বসে মেয়েটা!

চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে ললিতা, পায়ের নখ মেঝেয় আঁচড়াচ্ছে। কি বলতে চায়, সঙ্কোচে বলতে পারছে না। হঠাৎ নিচু হয়ে আলোর জোর কমিয়ে দিল। ঘর প্রায়-অন্ধকার। নিজেই তার কৈফিয়ত দিচ্ছে: বাবা ঘন ঘন উঠে তামাক খান, আলো দেখে এসে পড়তে পারেন।

সে না হয় বোঝা গেল। কিন্তু রাতদুপুরে কি জন্যে আকস্মিক

উদয়, সেটা পরিষ্কার হল না এখনো। দীনেশই তখন শুরু করে :
উঃ, কী করে যে মত আদায় করেছি ললিতা। সে এক মহাভারত।

বাপের ঘোরতর আপত্তি। পাত্রী আহা-মরি কিছু নয়, পাওনা-থোওনার ব্যাপারে লবডঙ্কা। কুটুম্বর পরিচয়েও মুখ উজ্জ্বল হয় না—কি না, পাত্রীর বাপ হলেন ভূতপূর্ব ডাকপিওন। দীনেশকে জাদু করেছে, বাপ-মায়ের কর্তব্যই হচ্ছে জাদুর কুহক থেকে মুক্ত করে আনা। কঠিন হয়ে বাপ বললেন, সুজনপুর থেকে সম্বন্ধ এসেছে, আমার তাতে অমত—

অতিশয় পিতৃভক্ত পুত্র। সঙ্গে সঙ্গে দীনেশ বলল, যে আজ্ঞে, ভেঙে দিন তাহলে। আমিই ওঁদের বলে দিচ্ছি।

পাত্রীপক্ষকে কি বলেছিল, ঈশ্বর জানেন। কথাবার্তা চাপা পড়ে গেল তারপর। বাপ খুঁজেপেতে উপযুক্ত সম্বন্ধ নিয়ে এলেন, এবারে ছেলের পালা। মায়ের কাছে বলল, আমার মত নেই।

পর পর আরও কয়েকটা সম্বন্ধ এলো, দীনেশ নাকচ করে দেয়।

বাপ সামনে ডেকে মুখোমুখি প্রশ্ন করেন : মতলব কি তোমার? বিয়ে করবেই না একেবারে?

মতে না পড়লে কি করব? বিয়ে সকলেরই করতে হবে, তার কোনো মানে নেই।

কিন্তু তোমায় করতে হবে। এক ছেলে তুমি বিয়ে না করা মানে নির্বংশ করা আমাদের। ছেলেপুলের কাছে পিতৃপুরুষের এক গণ্ডূষ জলের প্রত্যাশা—তাই থেকে বঞ্চিত করা।

দীনেশ বলে, ক'জনে আজকাল পিতৃপুরুষের তর্পণ করে, খোঁজ নিয়ে দেখুনগে। যা দিনকাল, বেঁচে থাকবারই ভাত জোটানো যায় না—মরার পরে তর্পণ করতে যাচ্ছে!

দীনেশের বাপ শক্ত মানুষ, কিন্তু স্ত্রী বিধবা-বোন, ছোটভাই ও ভাইবউ সকলে তাঁর বিপক্ষে—

লেখাপড়া-জানা রোজগেরে ছেলে বাপের হুকুমে সুড়সুড় করে

বরাসনে গিয়ে বসবে—অমন ধারা হয় না আজকাল। আমাদেরই অন্যায়।

সকলের দোষারোপে অতিষ্ঠ হয়ে বাপ ক্রমশ নরম হয়ে আসছেন। দীনেশকে ডেকে একদিন বললেন, তিন রকম চেয়েছিলাম আমি—পাত্রী, কুটুম্বিতে আর পণ। সে যাকগে, ষোলআনা পছন্দসই ক'টা ক্ষেত্রেই বা ঘটে! আমার ঐ তিন শখের একটা অন্তত পূরণ হবে—মেয়ে সুন্দরী হোক, কিম্বা বনেদি বাপের মেয়ে হোক, অথবা পণের টাকায় পুষিয়ে দিক—আমি তাহলে আপত্তি করব না।

হুঁ—বলে ঘাড় নেড়ে দীনেশ সরে পড়ল। কথাটা ধরেছে বলে মনে হয়। বাপ অতএব অপেক্ষা করে রইলেন তিনটে চারটে মাস। আরও গোটা দুই সম্বন্ধ এসেছে এর পর। কিন্তু কানেই নিল না দীনেশ।

বাড়ির মধ্যে কান্নাকাটি পড়বার অবস্থা। দীনেশের মা শুনিয়ে শুনিয়ে বলেন, যত বয়স হচ্ছে লোভ তত বাড়ছে। পণের টাকার জন্য ছেলেটাকে বিবাগী করে দিল। চাকরি-বাকরি ছেড়ে ছাই মেখে চিমটে হাতে জঙ্গলে-পাহাড়ে বেরিয়ে পড়ে কবে দেখ।

বাড়ির গিন্নি এই শোনাচ্ছেন। অন্য সকলে এতদূর স্পষ্টবাদী না হলেও মনোভাব যে এই রকম, বুঝতে বাকি থাকে না।

পুরোপুরি রণে ভঙ্গ দিলেন দীনেশের বাপ। বললেন, হোক তবে ঐ সুজনপুরে। বলো গিয়ে তাঁদের।

ছেলে তবু বিগড়ে আছে। বলে, কাজ নেই বাবা। মনে মনে তুমি রাগ করে আছ।

বিপন্ন বাপ বলেন, মনের খবর কি করে বলছ তুমি? রাগটাগ নেই আমার। যেখানে হোক বিয়ে করে কুল উদ্ধার করো, সংসারের অশান্তি থেকে অব্যাহতি দাও আমায়।

খুশি হয়ে মত দিচ্ছ তাহলে?

হ্যাঁ রে, হ্যাঁ। বলো তো শালগ্রাম-শিলা ছুঁয়ে না হয় দিব্যি করি।

দীনেশ বলে, তবে বাবা তুমিই লিখে দাও তাঁদের। সব বাপে যেমন লিখে থাকেন। আমি কি জন্যে বলতে যাব, বলা উচিত হবে না।

লিপি তবে হেঁটমুণ্ডে যুক্তকর হয়ে। যদি পিওনমশায় অধমের আরজি মঞ্জুর করেন।

দীনেশের বাপের চিঠি আজকে এসে পৌছল : দিন স্থির করে ফেলুন বেয়াইমশায়। পাত্রপক্ষ আমাদের হাঙ্গামা কিছু নেই, আপনার সুবিধা-অসুবিধাই বিচার্য। অনেক টাল-বাহানা হয়েছে, আশা করি আর অধিক দেরি হবে না।

দরখাস্তের তদন্তে দীনেশ এসে পড়ল, তার একটু পরেই চিঠি ডাকে এসে পৌছল। যোগাযোগ একেবারে আকস্মিক মনে হয় না। অটল-পিওনকে একেবারে বেয়াইমশায় বলে সম্বোধন। বাড়িতে উল্লাসের অন্ত নেই। আর কি—সমস্ত বাধা সরে গেছে, শুধু মন্ত্র-গুলো পড়িয়ে নেবার অপেক্ষা।

সে বাধা মন্তোরে যায়নি। বুঝতেই পারছ, কাঠখড় পোড়ানো হয়েছে বিস্তর—

সগর্বে দীনেশ নিজ কৃতিত্ব জাহির করে। বলছে বান্ধব রাখাল-রাজের কাছে, কিন্তু এবাড়ির কোন কানে পৌছতে বাকি নেই।

বলে, নিরুপদ্রব অসহযোগ কী সাংঘাতিক অস্ত্র! ইংরেজ হার মানল, কিন্তু বাবার সঙ্গে লড়াই তাদের চেয়ে কম কঠিন নয়। তাঁকেও ধরাশায়ী করে ফেলেছি।

সারা বিকাল ধরে এমনি বাহাদুরির গল্প। এক সময় তারপর অটল পাঁজি বের করে এনে ছেলে ও ভাবী-জামাইকে ডাকলেন। দিনক্ষণ দেখছেন, এপক্ষ-ওপক্ষের, সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে আলোচনা করছেন। মোটামুটি তারিখও একটা সাব্যস্ত হল। সেই তারিখ জানিয়ে কাল দীনেশের বাপের চিঠির উত্তর যাবে।

কাজকর্ম সেরে নিশ্চিন্ত মনে অটল দীনেশকে বললেন, এক-হাত

বসা যাক এইবারে বাবা।

দাবা খেলে দীনেশ চমৎকার। সুজনপুর এলে অটল ছাড়েন না, খেলতে বসে যান তাকে নিয়ে। আজকেও ছক পাতিয়ে নিয়ে অটল ডাকলেন, চলে এসো—

রাখালের বউ বাণা কাজের অজুহাত নিয়ে এঘর-সেঘর ঘুরঘুর করছিল। উদ্দেশ্য বিয়ের খুঁটিনাটি কথাবার্তা কানে শুনে নেওয়া। ননদিনার কাছে বলবে। বীণা হেসে বলে, এ কি বাবা, জামাইয়ের সঙ্গে খেলবেন?

অটল বলেন, জামাই হয়ে গেলে পরপর দৃষ্টিকটু লাগবে। তখন আর খেলব না। জামাই না হতে দু-এক বাজি খেলে নিই আজ।

খেলা চলল বেশ খানিকটা রাত্রি অবধি। বাড়িময় আনন্দ। খাওয়ারও গুরুতর রকমের আয়োজন। নিরঞ্জনকে রাখালরাজ না খাইয়ে ছাড়বে না। খেলা শেষ করে এই সময় দীনেশ এসে পড়ল: কাল আমার হাতে পড়বেন, মনে থাকে যেন। না খেয়ে চলে যান, চাকরি কেমন করে বজায় থাকে দেখব।

হাসিফূর্তিতে খাওয়াদাওয়া সেরে দীনেশ শুয়ে পড়েছে। ঘুমও এসে গেছে। রাত্তুপুরে ললিতা। কেমন করে কাজ হাসিল হল, দীনেশ ললিতার কাছেও সেই কাহিনী ফাঁদবার উদ্যোগে ছিল, ললিতা ঘাড় নেড়ে থামিয়ে দিল। বলে, একটা কথা না বলে কিছুতে সোয়াস্তি পাচ্ছি নে, সেই জন্যে চলে এসেছি।

বলার ভঙ্গিতে দীনেশ হকচকিয়ে যায়। লঘুকণ্ঠে তবু বলে, কথা বলার অফুরন্ত সময় তো এবার। চিরজীবন ধরে। দাঁড়িয়ে কেন, বসো ললিতা।

ললিতা বসল না। আসল বক্তব্য বেরুতে চায় না বুঝি মুখ দিয়ে, এটা ওটা ভূমিকা করে। বলে, সঙ্কোচ-লজ্জা কেলেঙ্কারির ভয় সমস্ত বিসর্জন দিয়ে আপনার ঘরে চলে এলাম।

দীনেশ উন্মুখ হয়ে আছে। না জানি কোন ব্যাপার! আকস্মিক

বজ্রপাত যেন ঘরের মধ্যে। ললিতা বলে, যাকে বরাবর জেনে এসেছেন সে ললিতা নই আর আমি। মামার-বাড়ি গিয়েছিলাম, সেখান থেকে ভিন্ন মানুষ হয়ে ফিরেছি। আমি কানা। বসন্তে একটা চোখ পুরোপুরি গিয়েছে—

স্তম্ভিত দীনেশ। তাকিয়ে থাকে ললিতার মুখে। আধ-অন্ধকারে দেখা যায় না, কণ্ঠস্বর কিন্তু কান্নার। যে চোখে দেখতে পায় না, সে চোখে অশ্রু ঝরানোর ক্ষমতা থাকে নাকি?

ললিতা বলছে, মামার-বাড়ি থেকে সোজা কলকাতা গিয়ে পাথরের চোখ নিয়ে এসেছি। কুমারী মেয়ে যে। ঠাকুরদেবতারা একটা খুঁতো-পাঁঠা বলি নিতে চান না, কানা পাত্রী কে নিতে যাবে। একেবারে নিখুঁত বানিয়ে দিয়েছে, দিনমানে ঠাহর করে দেখেও ধরতে পারবেন না যে, চোখ আমার ঝুটো।

একটু থেমে ললিতা আবার বলে, আপনাকে জানতে দেওয়া হয়নি। লোক জানাজানি হবে সেই ভয়ে মামার-বাড়ি থেকে চুপিচুপি কলকাতা চলে গিয়েছিলাম—সুজনপুর আসিনি। সবাই জানে মামার-বাড়িতেই বরাবর ছিলাম। বাইরের কোন লোক জানে না, একটা চোখ নেই আমার। বিয়েথাওয়া হয়ে গেলে তখন সকলে জানবে। শ্বশুর-বাড়িতেও জানতে পারবে।

ক্ষণকাল স্তম্ভিত হয়ে থেকে দীনেশ বলে, তুমিই বা তবে কেন জানাতে এসেছ?

ফাঁকি দিয়ে কেন কাঁধে ভর করব? সকলের আগে আপনারই সব জানা উচিত। একটা কথা, আমি এসে বলে গেলাম কেউ যেন জানতে না পারে। তাহলে আস্ত রাখবে না আমায়।

বলতে যাচ্ছিল দীনেশ আবেগ ভরেঃ তোমায় চাই আমি ললিতা। তোমার মনের কথা বলতে পারব না, কিন্তু আমি মনে মনে অনেককাল ধরে তোমায় বুকে তুলে নিয়েছি। মন্ত্র-পড়া এবং লৌকিক অনুষ্ঠানগুলোই বাকি। চোখ সত্যি সত্যি গিয়েছে কিম্বা

আমায় পরীক্ষা করছ, জানিনে। কিন্তু বিয়ে যদি আগেই হয়ে যেত, তাহলে কি করতাম ?

এই সমস্ত বলবার কথা, নবেলের নায়ক হলে এমনিই বলত। কিন্তু বলতে গিয়ে দীনেশ সামলে নিল। একচক্ষু স্ত্রী নিয়ে জীবন-ভোর ঘর করা—কথা ভেবেচিন্তে বলা উচিত বইকি। মুহূর্ত-কাল চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বলে, চলে যাও ললিতা। আমি দরজা দিই। কে কোত্থেকে দেখে ফেলবে, চুনকালি পড়বে আমাদের মুখে।

কোন প্রত্যাশা ছিল ললিতার—মুখ তুলে একবার তাকিয়ে দেখল। তারপর মুখে আঁচল ঢেকে দ্রুতপায়ে সে বেরিয়ে গেল।

সকালবেলা দীনেশের মারমূর্তি। রাখালরাজকে ডেকে বলে, আমি তোমাদের বাড়ির ছেলের মতো। সেই সুযোগ নিয়ে কানা-বোন গছাতে যাচ্ছিলে।

রাখাল আমতা-আমতা করে অবশেষে বলে, কী করব ভাই, কালব্যাধিতে ধরল। দুর্ঘটনার উপর মানুষের হাত কি ?

দীনেশ বলে, আমাকে তো ঘুণাক্ষরে জানতে দাওনি এত বড় ব্যাপার—

এক কথায় দু-কথায় তুমুল হয়ে উঠল ক্রমশ। এমন কি শঠ-জুয়াচোর অবধি বলে ফেলল। অ্যাটাচিকেস ও সাইকেল নিয়ে দীনেশ বেরিয়ে পড়ে। অটল রাখালরাজ এবং বাড়িসুদ্ধ সকলে স্তম্ভিত হয়ে দেখছে।

রাখালরাজকে দীনেশ বলে, দুধসরের এনকোয়ারিতে যাব নটার সময়। সাব-পোস্টমাস্টার হিসাবে তুমি যদি যাও, ঝঞ্ঝাট তাড়াতাড়ি মিটবে।

রাখালরাজ বলে, তা এখনই চললে কোথা ? চা-টা খেয়ে একসঙ্গে বেরুনো যাবে।

বাজারখোলায় চা পাওয়া যায় এ বাড়িতে জলগ্রহণ আর জীবনে নয়।

রাগে দুঃখে কথা বলতে পারে না। স্বপ্ন তারও চুরমার হয়েছে। অনেক লড়ালড়ি করে বাপের মত আদায় করেছিল, কিন্তু কানা-মেয়েকে বউ করে বাড়ি তুলতে রাজী হবেন না বাপ নন, মা-ও নন। আর দীনেশের নিজেরও কি ভাল লাগছে কানা-স্ত্রীর স্বামী হয়ে চিরজন্ম কাটানো। নবেল-নাটকে এমন ক'টা পাগল অবিবেচক আদর্শনিষ্ঠ মানুষ মিলতে পারে, দীনেশ কাল সারারাত্রি ভেবে দেখেছে নবেলের নায়ক সে হতে পারবে না।

॥ বার ॥

অতএব ভুধসরের তদন্তে এসে ইনস্পেক্টরের একেবারে ভিন্ন মূর্তি। মুখ থমথম করছে। কারণে অকারণে ক্ষণে ক্ষণে ধমক দিয়ে উঠছে নিরঞ্জনেরই উপর। নিরঞ্জন ভ্রূক্ষেপ করে না। বাইরের মূর্তি এটা— অভিনয়। বিচারক হয়ে আসামির সম্পর্কে এমনি ভাবই দেখাতে হয়, কারো মনে বিচার সম্পর্কে একতিল যাতে সন্দেহের উদয় না হয়।

দরখাস্তে সর্বপ্রথম সই কাঞ্চনমালা ঘোষের— তাঁর ডাক পড়ল। অভিযোগ লিখে পাঠিয়েছেন, মুখে এসে বলে যাবেন। প্রমাণ যদি হাতে থাকে তা-ও নিয়ে আসুন।

কাঞ্চন নেই, কালই কলকাতা চলে গেছে। দোমোহনির ঘাট অবধি সঙ্গে গিয়ে বিজয় নিজে শেয়ারের নৌকোয় তুলে দিয়ে এসেছে। বলে, আপনি আসবেন ইনস্পেক্টরবাবু, কেউ তো জানে না। জানলেও থাকার উপায় ছিল না তার। এক বান্ধবীর বিয়ে, সেই উপলক্ষে কলকাতা গেল। কাঞ্চনকে যদি জিজ্ঞাসাবাদ করতে হয়, আপনাকে আবার একদিন পায়ের ধুলো দিতে হবে।

শুনে নিরঞ্জন স্তম্ভিত। ইস্কুল বন্ধ দিয়ে কলকাতা গিয়ে বেরুল— বালিকা-বিদ্যালয়ের সেক্রেটারি, তাকে একটা মুখের কথা জানিয়ে গেল না।

নীলমণিকে ফিসফিস করে বলে, অরাজক অবস্থা একেবারে! আসুক ফিরে, কৈফিয়ত চাইব। এমনি ছাড়ব না।

নীলমণি বলে, ঘোড়ার ডিম! চাকরি ছেড়ে দেবে, বুঝো ঠেলা তখন। তোমার চাকরি আর কাঞ্চনের চাকরি একই রকমের নিরঞ্জনদা। চাকরি কেঁদে কেঁদে বেড়ায়, তুলে নেবার লোক জোটে না।

কাঞ্চন অনুপস্থিত। অতএব পরের জন বিজয়কে নিয়ে পড়েছে ইনস্পেক্টর দীনেশ। বিজয় যা খুশি তাই বলে যাচ্ছে, যত রাগের

শোধ নিচ্ছে। নিরঞ্জন বাধা দিতে গেলে দীনেশ দাবড়ি দিয়ে তাকেই থামিয়ে দেয় : কথার মধ্যে কথা বলেন কেন, চুপ করে থাকুন আপনি।

আধখানা সত্যের উপর সাড়ে-পনের আনা রং ফলিয়ে বলে যাচ্ছে - ক্ষমতা আছে বটে বিজয়ের, দিব্যি গালগল্প বানাতে পারে গো! নিরঞ্জনের মতো দায়িত্বহীন নৃশংস মানুষ দ্বিতীয় নেই— তুখসর গ্রামবাসী তু'কান পেতে অবাধে এইসব শুনে যাচ্ছে। নীরব থাকতে হবে তব নিরঞ্জনের। অথচ কাল রাত্রিবেলা ঠিক উল্টো রকমের কথাই বলছিল এই দীনেশ। যা-কিছু ওরা বলবে, তেড়েফুঁড়ে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠবেন।

হতভম্ব হয়ে রাখালরাজের দিকে তাকায়। তদন্তের ব্যাপারে রাখাল এসেছে—ব্রাঞ্চ-অফিসে আর সাব-অফিসে ঘনিষ্ঠ লেনদেনের সম্পর্ক, সাব-পোস্টমাস্টার হাজির থেকে অনেক ব্যাপারের হদিস দিতে পারবে।

রাখালের দিকে করুণ চোখে চেয়ে নিরঞ্জন বলে, এমন মারমুখি কেন বলো তো? উনি নিজেই তো কাল উল্টো রকম শিখিয়ে দিলেন : তেড়েফুঁড়ে আমার বেকবল যাবার কথা।

রাখাল তিক্ত কণ্ঠে বলে, সৃষ্টিসংসার উলটে গেল যে রাত্রের মধ্যে। কলি গিয়ে সত্যযুগ চলছে।

কালকের রাখালরাজও বদলে গিয়ে ভিন্ন এক মানুষ, কথাবার্তায় বোঝা যাচ্ছে। ললিতার কাণ্ড জেনে ফেলেছে রাখালেরা সবাই। ললিতা নিজেই বলেছে।

রাখাল বলে, অকথা-কুকথা বিস্তর শোনাল দীনেশ। জলগ্রহণ করবে না আমাদের বাড়ি, এখান থেকে সোজা শহরে চলে যাবে। তার জন্য কিছু নয়। কিন্তু কী পাগলামি সর্বনাশীর মাথায় চেপেছিল, নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মেরেছে। জেনেশুনে কানা-বউ কে ঘরে নেবে? ভাল দাম ধরে দিয়ে ওর বাপের কাছে পড়লে চোখের

দোষ হয়তো এখনো শোধন হয়, কিন্তু সে টাকা পাই কোথা। মামার-বাড়ি থেকে ফেরার পরে কতই তো ললিতাকে দেখেছে, চোখ দেখে সন্দেহ হয়েছে কিছু ? বলো। এক কাঁড়ি টাকা নিয়েছে ঐ চোখ বানাতে। না বললে দীনেশের বাপের সাধ্য ছিল না ধরতে পারে। বাবা শুনে অবধি অবিশ্রান্ত বকাবকি করছেন। তা বলে কি জান, এতবড় জিনিসটা গোপন করে জুয়াচোর হয়ে পরের ঘরে যাব কেন ? বাবা বোধহয় ধরেই মারতেন, মেয়ে বড় হয়েছে বলে বেহাই হও না, আমি গিয়ে ঠেকিয়ে দিলাম।

তদন্ত ঘোর বেগে চলেছে, কিন্তু নিরঞ্জনের সেদিকে বড় মন নেই। কানে যা আসে, শুনে যাচ্ছে এই পর্যন্ত। লেখাপড়া শিখে, এবং সদরে শহর জায়গায় থেকেও ললিতা সেকেলে রয়ে গেছে। বলতে হয় বিয়েথাওয়া চুকেবুকে সকল দিক ঠাণ্ডা হয়ে গেলে কোন এক সময় দীনেশের কাছে চুপিচুপি বলতে পারত। রাখালরাজের এই কথা, এবং কথাটা অযৌক্তিক নয়। দীনেশই তখন চাপা দিয়ে রাখত কানা বউয়ের বর হবার লজ্জায়। কাকপক্ষীতে জানতে পারত না।

আজ দীনেশের মনমেজাজের ঠিক নেই। মেজাজ ঠিক থাকে না হেন অবস্থায়। কতকাল ধরে প্রত্যাশা, কত লড়াই বাপের সঙ্গে। সিদ্ধি হাতের মুঠোয়, তখনই সব বরবাদ। আক্রোশটা এখন ললিতার সম্পর্কীয় যে যেখানে আছে, সকলের উপর। মেয়ে কানা সে কথা গোপন রেখে নাচিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে তাকে। রাখালরাজের সঙ্গে নিরঞ্জনের ঘনিষ্ঠতা, ক্রোধ তাই নিরঞ্জনের উপরেও। তদন্তে বসে বিরোধী পক্ষের কথাই শুনে যাচ্ছে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনছে। আচমকা এক এক প্রশ্ন—প্রশ্ন নয় উস্কানি। তাইতে আরো আস্কারা পেয়ে যা মনে আসে বানিয়ে বানিয়ে বলে যাচ্ছে।

কৃতজ্ঞ হারাধন ধাড়া নিরঞ্জনের হয়ে কি বলতে গিয়েছিল, তাকে এক বিষম ধমক : চুপ করো। সময়ের দাম আছে আমার।

ধানাই-পানাই শুনতে চাইনে। বিজয়বাবু অত্যাচারী হন কি সদাশয় হন সে বিচারে আমার এক্তিয়ার নেই। আইন-আদালত খোলা আছে, ইচ্ছে হয় সেখানে চলে যেও।

সকলের দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে বলে, যা শোনবার শুনে নিয়েছি। কাউকে কিছু আর বলতে হবে না। ঘাস খাইনে আমি, বঝতে কিছু বাকি নেই। আমার যা লিখবার লিখে পাঠাই। উপরে গিয়ে তদ্বির করতে পারেন। সুপারেনটেণ্ডেন্ট নিজেই হয়তো আসবেন, যা বলবার তাঁর কাছে বলবেন। তবে নিশ্চিত জেনে রাখুন -

নীলমণি মনে মনে গর্জাচ্ছে. সান্তুদি চন্দ্রপুলি-গোপালভোগ বানিয়ে বানিয়ে খাইয়েছে, এ-গ্রাম সে-গ্রাম ঘুরে পাঁঠা-মুরগি এনে জুটিয়েছি, মোটা মানকচু আর উৎকৃষ্ট নলেনগুড় সাইকেলে বেঁধে দিয়েছি। এসো তুমি আবার কখনো– খাওয়ার ধুলোমাটি, ছাদনা বেঁধে দেবো উনুনের ছাই।

দীনেশ তার কথা শেষ করল : জেনে রাখুন, এত সব সাংঘাতিক অপরাধের পর নিরঞ্জনবাবুকে কোনক্রমে আর পোস্টমাস্টার রাখা চলবে না। পোস্টাপিসের পক্ষেও খুব খারাপ। উঠে যেতে পারে। রিপোর্ট আমি সব কথা পরিষ্কার লিখে দেবো।

আকাশ ভেঙে পড়ে এবার গ্রামবাসী সকলের মাথায়। দরখাস্তে সই দিয়েছে, বিপক্ষ-দলের সেই মানুষগুলো পর্যন্ত আতঙ্কে ওঠে। নিরঞ্জন বিদায় হোক, তারা বড় জোর এই চেয়েছিল। একেবারে পোস্টাপিস ধরেই টান—কে ভাবতে পেরেছে।

বিজয় তর্ক করে : দোষ করেছে পোস্টমাস্টার, তার চাকরি যাবে। পোস্টাপিসের কি ?

দীনেশ জবাব দিতে যাচ্ছিল, নীলমণি ফুঁসে উঠল তার কথার আগেই : নতুন পোস্টমাস্টার পাচ্ছ কোথা মশায়রা ? মাথায় পোকা না থাকলে এ চাকরিতে কেউ আসে না। মাইনে চার টাকা, আর এই বাবদে খরচা অন্ততপক্ষে বিশ। আপিসঘরে বসে কাজ, তার

উপরে গ্রাম ঘুরে ঘুরে চিঠি বিলি করা আর টিকিট-পোস্টকার্ডের বাকি দাম আদায়ের কাজ। এ মানুষ কোথায় পাবে নিরঞ্জনদা ছাড়া?

দীনেশ বলে, এক্সপেরিমেন্টাল পোস্টাপিস আপনাদের। শিকড় বসেনি, কলমের এক আঁচড়ে তুলে দেওয়া যায়। সরকার ভাবতে পারেন, গেঁয়ো দলাদলি রয়েছে, তার উপর লোকাল পোস্টমাস্টার মেলে না—কাজ নেই ঝঞ্ঝাট পুষে রেখে। সুজনপুরের অধীনে যেমন ছিল, তেমনি চলবে আবার।

মুখ শুকাল উপস্থিত সবজনার। পোস্টাপিস ছুধসরে ছিল না, সে একরকম। একবার বসে যাওয়ার পর সে জিনিস টিকিয়ে রাখতে পারছে না, পুনর্মূষিক হয়ে সুজনপুরের অধীনে চলে যাবে—এমন কাণ্ডের পর সুজনপুর গ্রামে গায়ে থুথু দেবে। কারও পানে মুখ তুলে তাকানো যাবে না।

দরখাস্তের ব্যাপারে বড় মাতব্বর বিজয়, তাকেই সকলে দুষছে। নিজেদের মধ্যে না মিটিয়ে সদরের সুপারিনটেণ্ডেন্ট অবধি ধাওয়া করেছে। এদ্দুর কেলেঙ্কারি যখন ঘটালে কাজটা তুমিই নিয়ে নাও। বড়লোক বলে চিঠি বিলি করতে যদি লজ্জা করে, টাকা দিয়ে আলাদা লোক নিযুক্ত করো। তোমার হয়ে সেই লোক চিঠি বিলি করে বেড়াবে। নিরঞ্জনদা একলা হাতে পোস্টাপিসের সব ধকল সামলে এসেছে। তার পিছনে লেগেছ—এ দায়ভার তোমাকেই কাঁধে নিতে হবে। ছাড়াছাড়ি নেই।

এখন আর দল-বেদল নেই। সবসুদ্ধ মিলে দীনেশকে ধরা-পাড়া করছে: ছুধসরের ইজ্জত যায়, কলম এইবারটা চেপে দিন। আবার যদি কখনো গণ্ডগোল দেখেন, তখন রেহাই করবেন না।

ভেবেচিন্তে দীনেশও নরম হয়েছে এখন। আক্রোশটা তো রাখালরাজদের উপরেই—ছুধসরের লাঞ্ছনা ঘটিয়ে সুজনপুরকে আকাশে তুলে ধরতে যাবে কেন? মুরুব্বিরাও ওদিকে তারস্বরে নিরঞ্জনের

গুণগান করছেন : ছেলেটা সত্যি ভালো, গ্রামের চূড়ামণি। সকলের জন্য দরদ—এই দরদটাই কাল হয়েছে। এখন থেকে আমরা খুব নজরে রাখব। নিরঞ্জন, তুমি বাবা একবার দিয়ে দাও, কেউ বিরুদ্ধে বলতে পারে এমন কাজ কখনো আর হবে না। দুধসরের উপর টান তোমার মত কারো নয়, গাঁয়ের মুখ চেয়ে করো এইটে বাবা।

নিরঞ্জন সঙ্গে সঙ্গে রাজী। ব্যক্তিগত মান-অপমান বোঝে না সে। জলচৌকিতে বসেছিল, উঠে দাঁড়িয়ে গলা-খাঁকারি দিল একবার। একউঠান মানুষের মধ্যে গলা তবু কেঁপে যায়। বলে, তাই হবে সকলে যেমনটি চাচ্ছেন। সমস্ত গাঁয়ের নাম নিয়ে দিব্যি করে বলছি। পোস্টাপিস বজায় থাকুক। আমি না-হয় মানুষই রইলাম না আজ থেকে। ডাকবাক্সে যা-কিছু পড়বে চোখ বুজে চালান করে দেবো। মেলব্যাগে যা কিছু আসবে সে জিনিস বিষ হোক আর বোমা হোক ঠিকানায় পৌঁছে দিয়ে আসব। আর শুনে রাখুন মশায়রা, নগদ পয়সা ছাড়া খাম-পোস্টকার্ড বিক্রি বন্ধ। ফেল কড়ি মাখ তেল। তাতে মামলা খারিজ হল কি ছেলের চিকিচ্ছে আটকাল—আমি কিছু জানিনে। পোস্টমাস্টারের এসব জানবার এক্তিয়ার নেই।

মিটমাট হয়ে গেল। নিরঞ্জন যেমন পোস্টমাস্টার আছে, তেমনি থেকে যাবে। গ্রামবাসী সকলে এ বিষয়ে একমত। দরখাস্তের পিঠে বিজয়ের সই সকলের উপরে। কাঞ্চন গাঁয়ে থাকলে তারই সই নিশ্চয় ওখানে আসত।

সেদিন আর নয়, পরদিন নিরঞ্জন সুজনপুর পিওনমশায়ের বাড়ি গেল। ললিতা তো কাণ্ড করে বসেছে. পরের অবস্থা কি এখন ? ছোটবোনকে রাখালবাজ প্রাণের অধিক ভালবাসে। ক্ষমতায় কুলায় না, তা সত্ত্বেও অশেষ রকম কষ্ট করে বোনকে পড়িয়েছে। ভাল ঘরে বিয়ে হয়ে বোন সুখে-শান্তিতে থাকবে—কত বড় অভিলাষ তার!

দীনেশের সঙ্গে এত যে ভাব জমল, তার মূলে বাখাল্লেব মতলব কাজ করেছে বই কি !

সন্ধ্যারাত্রি এখন, কিন্তু বাড়িতে আলো নেই, মানুষের সাড়াশব্দ নেই। এই পরশু দিনও এসেছিল, তখন কেমন জীবন্ত ভাব চারিদিকে, কত হাসি-হুল্লোড়।

বাইরের উঠোনে দাঁড়িয়ে নিরঞ্জন ইতস্তত করছে। আবছা আঁধারে কোন দিক দিয়ে ললিতা এসে পড়ল।

দাঁড়িয়ে কি ভাবছেন নিরঞ্জনদা ?

ভাবছি, ঘুমিয়ে গেছ তোমরা সবাই, কিম্বা বাড়িই ছেড়েছ একেবারে।

ললিতা হঠাৎ ঘনিষ্ঠ হয়ে এসে নিম্নকণ্ঠে বলে, বাড়ি আমাকেই ছাড়তে হবে নিরঞ্জনদা। না ছেড়ে উপায় নেই। সারাই তো, বাবা-দাদা চিরকাল কেন পুষতে যাবেন ? সে অবস্থা নয়ও ওঁদের। আপনি কোন-একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারেন না নিরঞ্জনদা ? কাল থেকে ভাবছি। আপনাদের মেয়ে-ইস্কুল তো বেশ জমে যাচ্ছে। পারেন তো ওর মধ্যে ঢুকিয়ে দিন। একটা চোখ রয়ে গেছে—পড়াতে বেশ পারব, অসুবিধা হবে না।

এমন অন্তরঙ্গভাবে কোন দিন ললিতা কিছু বলেনি। এ যাবৎ কথাই বা ক'টা বলেছে নিরঞ্জনের সঙ্গে ! ঝগড়াঝাটি নিদারুণ রকমের চলছে বোঝা গেল। ললিতার পক্ষে অসহ্য হয়েছে।

হিতার্থী অভিভাবকের মতো নিরঞ্জন বোঝাতে যায় ললিতাকে : নিজের দোষটাও দেখবে তো ! বিয়েথাওয়ায় ভাংচি দেয় শত্রুপক্ষ। তোমার বিয়ের ভাংচি নিজেই তুমি দিয়েছ।

দৃঢ়কণ্ঠে ললিতা বলে : না, কোন দোষ নেই আমার। অসুখে কানা হয়ে গেলাম, তাতে আমার দোষ ছিল না। সত্য প্রকাশ করে দিলাম—সেটা কর্তব্য, তাতেও কোন দোষ হয় না।

উঃ, এই রকম জ্যাক এত গালমন্দ খাবার পরেও। লেখাপড়া শেখালে মেয়েগুলো এমনি হয়ে দাঁড়ায় বটে। দেখ দুধসরের কাঞ্চনটিকে, দেখ সুজনপুরের এই ললিতা। সংশোধনের অতীত এরা।

ঘরে একলা রাখালরাজ। নিরঞ্জন ডাক দিল সন্ধ্যাবেলা ঘর অন্ধকার করে বসে আছ কেন? বাইরে এসো।

রাখাল দাওয়ায় এসে বসল। দুজনে পাশাপাশি বসেছে। ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলল রাখাল। বলে, ললিতার এক চোখে অন্ধকার, দুটো চোখ বজায় থেকেও আমি চতুর্দিকে অন্ধকার দেখছি। পাশ-করা মেয়ে ছাড়া দীনেশ বিয়ে করবে না—পেটে না খেয়ে বোনকে তাই পড়িয়েছি। কিনা চিরজন্মের হিল্লে হবে, সুখে থাকবে আমার বোন। তা দেখ, হতভাগী আখের বুঝল না, নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারল।

নিরঞ্জন বলে, যাই বলো, তোমার দীনেশও কিন্তু লোক সুবিধের নয়। খোঁচা দিয়ে ইচ্ছে করে তো চোখ নষ্ট করেনি—রোগপীড়ের ব্যাপার। বিয়ের পরে হলে কি করতিস তুই শুনি? সত্যি ব্যাপার খুলে বলেছে— সত্যসন্ধ মেয়েকে তো লুফে নেওয়া উচিত।

রাখালরাজ সায় দিয়ে বলে, আমাদের শতেক অপমান করেও আক্রোশ মেটেনি। দশের মধ্যে তোমার অত হেনস্থা—যেহেতু বন্ধুলোক তুমি আমার।

নিরঞ্জন বলে, চাকরিটা খুব বক্ষে হয়ে গেল আমি গেলে পোস্টাপিসও সঙ্গে সঙ্গে উঠে যেত—

নিরঞ্জনের পালা এবার। দুঃখিত স্বরে বলে, লড়ালড়ি করে দুটো জিনিস গড়লাম। টিকিয়ে রাখতে এখন প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ। পোস্টাপিসের এই গতিক। আর বালিকা-বিদ্যালয়ের অবস্থা, তোমার কাছে বলতে কি—সব জায়গায় গ্রীষ্মের-বন্ধ দেয়, মাস্টার অভাবে আমরা শীতের বন্ধ দিয়ে বসে আছি। কাঞ্চনের কলকাতা-মুখো

নজর, গাঁয়ের উপর একফোঁটা মমতা নেই, সুবিধা পেলেই পাকা-পাকি গিয়ে উঠবে।

অনেকক্ষণ এমনি সুখ-দুঃখের কথা। দুধসর ও সুজনপুরে শত্রু সম্পর্ক—ছেলেবয়সে এই দুজনের কুলতলা-আমতলায় ঘোরাঘুরির মধ্যে ভাব জমে গিয়েছিল। সে বন্ধন কাটিয়ে কোনোদিন এরা শত্রু হতে পারল না।

॥ তের ॥

মঞ্জুলার বিয়ে উপলক্ষ করে কাঞ্চন কলকাতায় গেছে। বিয়ের আমোদস্ফূর্তি—তার মধ্যে তার চিরকালের কলকাতার খবরাখবর নেয়। এই কলকাতার দিকে অহোরাত্রি সে তো মুখ করে বসে আছে।

সমরের কথা উঠে পড়ে। রানীশঙ্করী লেনের বাসিন্দা মিষ্টি কথার ঝরনা সেই কন্দর্পটি। নেমন্তন্ন করা হয়েছে তাঁকে ? আসবে ?

মঞ্জুলা ভ্রূকুটি করেঃ অন্তত একটি হাজার নেমন্তন্ন হলে তবেই তার কথা ওঠে। আমাদের অবস্থা জানিস তুই, দেশের অবস্থা দেখছিস। অত নেমন্তন্ন হয়নি।

হাজারের ওপার গিয়ে পড়ছে ? কিন্তু মনে পড়েছে, একদা সে একজনই ছিল। পরিবারের মানুষ হয়ে গিয়েছিল তোদের।

এক ঝলক হেসে নিয়ে আবার বলে, আমাদেরও—

মঞ্জুলা বলে, তোর সঙ্গে তাই নিয়ে বন্ধুবিচ্ছেদের গতিক। মনে পড়ে ? কিন্তু যা বললি কাঞ্চন, মুখের বার করবিনে, খবরদার ! আমার বরের কানে না ওঠে।

হেসে উঠে আবার ভয় দেখায়ঃ আমিও তাহলে ছাড়ব না। তোর বিয়ের সময় গিয়ে তোর বরের কানে তুলে দিয়ে আসব। সমরকে জড়িয়ে—ঠিক গণে দেখিনি অবশ্য-- বোধহয় দেড় ডজন বরের কানে এখনি তুলে দিয়ে আসতে পারি। গোপীমন-মনোহরণ মডার্ন কেষ্ট-ঠাকুর আর কি !

কলকাতায় এসে এই ক'দিনে কাঞ্চনও বিস্তর জেনেছে। তিক্তকণ্ঠে বলে, কার কুঞ্জে এখনকার আনাগোনা, খবর রাখিস ?

সে ভাগ্যবতী হলেন শ্রীমতী অর্পিতা। খবরের জন্য চরবৃত্তি করতে হয় না, সামান্য সস্তিকের জ্ঞানেই বলে দেওয়া যায়। যেহেতু অর্পিতা

হল অতুলেন্দ্র পালের মেয়ে।

চমক লাগে কাঞ্চনের : মামার অফিসের অতুলেন্দুবাবু। মামার এ্যাসিস্টেন্ট তো উনি ছিলেন।

জেঠাবাবু রিটায়ার করেছেন, তোমার মামার চেয়ারে পাল-মশায় এবার। বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছে। সমর অতএব আঠার মতন লেপটে আছে সেখানে। হতেই হবে।

শ্যামকান্ত রিটায়ার করেছেন—জগন্নাথ গোনতর মামলা চালিয়ে যাচ্ছেন। মামলার একটা হেস্তনেস্ত না হওয়া পর্যন্ত কোম্পানি বাইরে থেকে পাকা জেনারেল ম্যানেজার আনবে না—ভিতরের লোক নিয়ে অস্থায়ীভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। অতুলেন্দু হেন মানুষ তাই জেনারেল ম্যানেজার। এত সমস্ত খবর কাঞ্চন জানত না, জানবার কথাও নয়।

মঞ্জুলা বলে, দেখেছিস তুই অর্পিতাকে?

একবার। ওর বড় বোনের বিয়েয় গিয়েছিলাম। সে মেয়েটার চাকচিক্য ছিল তবু।

অর্পিতার চাকচিক্য না থাক, বাপের ম্যানেজারি হয়েছে। অতুলবাবু বোঝেন সেটা—দিন স্থির করবার জন্য তাড়াতাড়ি করছেন—

বিবস কণ্ঠে কাঞ্চন প্রশ্ন করে : হচ্ছে না কেন তবে?

মঞ্জুলা বলে, সমর আরও বেশি বোঝে। ঈশ্বর ওকে দুর্লভ চেহারা দিয়েছেন। আর চাটুবাক্য বলবার অপূর্ব ক্ষমতা। বিয়ে চুকেবুকে গেলে তো অস্ত্র দুটো অকেজো হয়ে পড়ল। চালনার জায়গা পাবে না। সেই জন্যেই ঝুলে পড়তে নারাজ।

কাঞ্চন বলে, আরও আছে। অতুল-মামা পাকা-ম্যানেজার নন, অস্থায়ীভাবে আছেন। পাকা যদি নাই-ই হন শেষ পর্যন্ত—ঝুলিয়ে রাখছে, নতুন কেউ যদি আসে তাদের সঙ্গে জমাতে হবে। জমিয়ে নিয়ে কন্ট্রাক্ট বাগাবে। সমরের আনাগোনার মধ্যে প্রেম একফোঁটাও

নেই, পুরোপুরি পাটিগণিত।

এ অভিমত মঞ্জুলারও। সবিস্ময়ে মুহূর্তকাল সে কাঞ্চনের দিকে তাকিয়ে থাকে ঃ বুঝলি তবে এদ্দিনে ? উপরে উঠবার সিঁড়ি ছাড়া কিছু নই আমরা। পা ফেলে ফেলে উঠে গিয়ে কাজকর্ম বাগায়।

কথার সূত্রে কাঞ্চন জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা, গোপাল সামন্ত বলে যে বুড়ো আরদালিটা ঘুরত, মামার অত্যন্ত অনুগত—

লুফে নিয়ে মঞ্জুলা বলে, সে-ও কি আলাদা একটা-কিছু ? এখন অতুলেন্দ্র পালের বাড়ি মোতায়েন থাকে। ঠিক যেমন তোদের ওখানে থাকত। মিস্টার পাল তোর মামার অফিসের চেয়ার পেলেন, সেই সঙ্গে সমস্ত-কিছু পেয়ে গেলেন—মামার যা যা ছিল। মায় সমর নামের জীবটিকে মেয়ের পিছু পিছু ঘোরার জন্য।

তিক্তকণ্ঠে আবার বলে, সত্য-সাধুতা ভালবাসা-কৃতজ্ঞতা দেশ ছেড়ে বিদায় নিয়েছে রে কাঞ্চন, কথাগুলোই শুধু মানুষের ঠোঁটে ঠোঁটে ঘোরে।

কাঞ্চন বলে, বড্ড চটে গিয়েছিস। তুই-আমি সামান্য মানুষ, গণ্ডির মধ্যে আনাগোনা। দেশের কতটুকু দেখেছি, মানুষ চিনি কজনকে ? দেশ বলতে কি কলকাতার শহর ? মানুষ বলতে সমর শুভ শুধু ?

এর পর এক রবিবারে কাঞ্চন অতুলেন্দ্রের বাড়ি গিয়ে পড়ল। মামা-মামীর সঙ্গে একবার এবাড়ি সে নিমন্ত্রণে এসেছিল অতুলেন্দ্রের বড়মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে। মামাবাড়িতেও তাঁকে কয়েকবার দেখেছে, দায়ে-দরকারে জগন্নাথের কাছে যেতেন। অতুলেন্দ্র তবু চিনতে পারেন না, কাঞ্চনকে আত্মপরিচয় দিতে হল। বলে, কলকাতায় এসেছি সামান্য কয়েকটা দিনের জন্য। মামা কোথায়, ঠিকানা জানিনে। আপনার যদি জানা থাকে, সেজন্য এসেছি।

অতুলেন্দ্রও জানেন না। তবে আছেন তিনি কলকাতায়। মাস

তিনেক আগে হাইকোর্ট-পাড়ায় হঠাৎ দেখা। না-চেনার ভান করে জগন্নাথ সরে পড়ছিলেন, অতুলেন্দ্র দ্রুত সামনে গিয়ে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। জবাব না দিয়ে জগন্নাথ ইতি-উতি তাকান, তারপর অবোধ্য স্বরে কি-একটু বলে পাশের এক গলিতে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। অতএব কলকাতা ছেড়ে কোথাও তিনি যাননি। আরও পাকা প্রমাণ, কোম্পানির বিরুদ্ধে তার কেস হাইকোর্টের লিস্টে উঠে গেছে। প্রচুর অর্থব্যয় এবং বিশেষ রকমের ফন্দির ছাড়া এমন নিখুঁতভাবে কেস সাজানো সম্ভব নয়। পরিচিত চক্কর গলবালে জগন্নাথ প্রাণ ঢেলে ঐ কাণ্ড করছেন শুধু—

অতুলেন্দ্র মন্তব্য করলেন, পাকালোক হয়ে কেন যে এত সব করতে গেলেন বুঝি না। অত বড় কোম্পানি, ডিরেক্টররা কোটিপতি —চুনোপুঁটি উনি তাদের সঙ্গে লাগতে গেলেন! ধরলাম জিত হল মামলায়, ওরা তখন পাল্টা মামলা করবে, সেটা জিতলেন তো ফের আবার। জিতে জিতেও শেষ হয়ে যাবেন। তার চেয়ে মোটা কমপেনসেসনের কথা হয়েছিল—হাসিমুখে হাত পেতে নিয়ে কর্তা-গিন্নি বাকি দিনগুলো নির্ঝঞ্ঝাটে কাটিয়ে দিতে পারতেন।

মনিবদের বিস্তর তাবেদারি করে অতুলেন্দ্র দুর্লভ আসনে বসেছেন—জগন্নাথের মামলা-মোকদ্দমার ফলে সমস্ত কেঁচে না যায়, এই আশঙ্কা। তাঁর মনের কথা কাঞ্চনের বুঝতে বাকি থাকে না। কিন্তু এসেছে সে তাঁর কাছে নয়, গোপাল সামন্তর খোঁজে।

গোপাল আসে তো আপনার এখানে ?

অতুলেন্দ্র বলেন, তাকে নিউ-মার্কেটে পাঠালাম ভাল মাটন আনবার জন্যে। এদিককার জিনিস অখাদ্য। জগন্নাথবাবুর ঠিকানা সে-ও জানে না, একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

কাঞ্চন গড়িমসি করে। গোপালের সঙ্গে দেখা না করে যাবে না।

অর্পিতা আছে ? দেখা করে আসি—

দোতলায় উঠে যায়। অল্পসল্প আলাপ অর্পিতার সঙ্গে—তাব বড় দিদির বিয়েয় এসে সেই সময় আলাপ হয়েছিল। মামার দৌলতে সেদিন কত খাতির এবাড়ি। আজকে অর্পিতা চিনতেই পারে না—সবিস্তারে পরিচয় দিতে হল।

তবে জমিয়ে নিতে দেরি হয় না। এই ক্ষমতা আছে কাঞ্চনের—বিশেষ করে সমবয়সি মেয়ের সঙ্গে। দশ মিনিটের মধ্যে প্রায় অভিন্ন-হৃদয়। 'তুমি'তে এসে গেছে, আর খানিক পরে 'তুই'-এ আসাও বিচিত্র নয়।

কথার মাঝখানে হঠাৎ কাঞ্চন বলে, গুহ আসে তো এখানে—পেলিকান ইণ্ডাস্ট্রির সমর গুহ?

তুমি জানলে কি করে?

ছলাৎ করে রক্ত নেমে আসে অর্পিতার মুখে, মুখ রাঙা-রাঙা দেখায়। অর্থাৎ অতিশয় গদগদ অবস্থা—মঞ্জুলা যা বলল, তার বেশি বই কম নয়। কাঞ্চন মনে মনে হাসে। খেলাতে চায় একটুখানি। কৌতুক দেখবে, বুঝে নেবে মনের গতিক।

চমৎকার মানুষ সমরবাবু—নয়? শিক্ষিত রুচিবান চৌকস মানুষ। কী সুন্দর কথাবার্তা, যখন হাসেন হাসিমাখা মুখের ফটো তুলে রেখে দিতে ইচ্ছে করে।

মুগ্ধদৃষ্টিতে হঠাৎ তাকিয়ে পড়ে অর্পিতার দিকে। ক্ষণকাল তাকিয়ে থেকে বলে, তুমিও সুন্দর। খাসা হবে।

এবং সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলো বিশেষণ ফড়ফড় করে বলে যায়। অর্পিতার সম্বন্ধে—তার স্তুতিবাদ।

অর্পিতা অবাক হয়ে গেছে। হেসে উঠে কাঞ্চন বলে, হচ্ছে না ঠিক ঠিক?

অর্পিতা বলে, তুমি কি করে জানলে? আস্তি পেতে শুনে মুখস্থ করে রাখার মতো। ভাবভঙ্গিগুলো পর্যন্ত। মফস্বল থেকে সেটা তো সম্ভব নয়—নিশ্চয় জ্যোতিষ-বিদ্যার চর্চা আছে।

না ভাই, গ্রামোফোন-রেকর্ডে শোনা আছে। সে রেকর্ড আমার মামাবাড়ি বাজত। মঞ্জুলাকে চেনো কিনা জানিনে, তার ওখানেও বেজেছে। বেজেছে আরো অনেক জায়গায়, শুনতে পাই। এক সুর এক কথা ---শুনতে ভাল লাগে, প্রাই মখস্ত হয়ে যায়।

এমনি সময় গোপালের গলা পাওয়া গেল। ফিরেছে নিউ মার্কেট থেকে। কাঞ্চন তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল।

ছাড়তে চায় না অর্পিতা। বসো ভাই আর একটু। শুনি।

কি হবে শুনে? শুনে তো মন খারাপ কেবল। দু এক দিনের জন্য কলকাতায় আসা, কত জায়গায় যেতে হবে আমার। পারি তো আর একদিন আসব। আজকে আসি ভাই।

সওদা রেখে গোপাল উঠানে নেমেছে সেই সময় কাঞ্চনের সঙ্গে দেখা। উল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠে। দিদিমণি যে! কবে এলে, কোথায় উঠেছ?

তোমার জন্যে বসে আছি গোপাল। একটা কথা আছে, শোন এদিকে—

'শোন' 'শোন' করে গোপালকে নিয়ে রাস্তায় এসে পড়ল কাঞ্চন। আরও কয়েক পা গিয়ে বলে, মামার কাছে নিয়ে চল আমায়।

থমকে দাঁড়িয়ে গোপাল নিরীহের মতো মুখ করে বলে, কোথায় থাকেন তিনি?

জানলে তোমায় খোশামোদ করতে যাব কেন? সেখানেই তো ছুটে যেতাম সকলের আগে। আমার যে কী তাঁরা, তোমার অজানা নেই গোপাল।

গোপাল বলে, আমি ঠিকানা জানিনে---

রেগে গিয়ে কাঞ্চন বলে, ধাপ্পা অন্যলোকের কাছে দিও। সোজা কথায় বলো নিয়ে যাবে না সেখানে। এদ্দিন পরে এলাম, আমার মামা-মামীর সঙ্গে চোখের দেখাটাও দেখতে দেবে না। হোক তাই. উপায় কি?

গোপাল ভাবে, আর এক-পা দু-পা করে পথ এগোয়।

কাঞ্চন বলে যাচ্ছে, তুমি যে লেখাপড়া শেখোনি, ফড়ফড় করে ইংরেজী বলতে পারো না, ভণ্ডামিও তাই রপ্ত হয়নি। একবার যাঁকে মান্য দিয়েছ, দুঃসময় বলে সম্পর্ক ছাড়োনি তার সঙ্গে। এত মানুষ থাকতে তোমারই খোঁজে খোঁজে এসেছি। মামার বাসায় নিয়ে যাবে তো চলো। নয় তো সোজাসুজি বলে দাও, ফিরে চলে যাচ্ছি।

অনেক গলিখুঁজি পার হয়ে খোলার বস্তির ঘরে মামা-মামীর আবিষ্কার হল। হায়রে হায়, টমাস ব্রাউটন কোম্পানির দোর্দণ্ড-প্রতাপ ম্যানেজার জগন্নাথ চৌধুরী সস্ত্রীক আজ এমনি জায়গায় বসতি পেতেছেন। এ হেন অজ্ঞাতবাসের জায়গা কলকাতা শহর ছাড়া দুনিয়ার আর কোনোখানে ভাবতে পারা যায় না।

কাঞ্চন কেঁদে পড়ল।

জগন্নাথ বলেন, কাঁদ—কিন্তু শব্দ বেরুলে হবে না মা। বস্তির সবাই উঁকিঝুঁকি দেবে।

কাঞ্চন বলে, একি বেশ তোমার মামীমা। দু-হাতে দুগাছি লাল শাঁখা—এত গয়না ছিল, সমস্ত গেছে?

জগন্নাথই জবাব দিলেন, এক কুচিও অপব্যয় করিনি রে। গয়না বেচে পেটে খাইনি—মামলার জন্য গেছে একখানা একখানা করে। সব গয়না খতম, হাইকোর্টের তদ্বিরও শেষ। রায় বেরোনোর অপেক্ষায় আছি। প্রতিপক্ষের বিস্তর পয়সা, জেদ করে সুপ্রীম কোর্টেও লড়তে পারে। তখন কি হবে ভাবি। কিন্তু ছাড়ব না আমি—দেশের মধ্যে বিচার আছে কিনা, মরণপণ করে দেখব।

বেরিয়ে এসে কাঞ্চন দীর্ঘশ্বাস ফেলে গোপালকে বলে, আনতে চাচ্ছিলে না—তাই বোধহয় ভাল ছিল। কেন যে দেখতে এলাম এমন জায়গায় এমনিভাবে—

॥ চোদ্দ ॥

কলকাতা থেকে কাঞ্চন ফিরে এসেছে। শ্বশুরবাড়িতে মঞ্জুলা। রওনা হবার দিনও কাঞ্চন সেখানে গিয়ে দেখা করে এসেছে। আবার দুধসরে পৌঁছে চিঠি সেইদিনই। সে চিঠিও ছোটখাট নয়। প্রায় এক মহাভারত :

আছিস কেমন ভাই মঞ্জুলা? লাগছে কেমন? রাত্রিগুলোর খবর শুনি আগে। এখন তো খানিক পুরনো হয়ে এলি, মিনিট কয়েক দিচ্ছে এখন ঘুমোতে? কী সব বলছে এবার? কে কার কাছে জব্দ—তোর কাছে বর, না বরের কাছে তুই?

ভূমিকায় এমনি সব হাসাহাসি। পাতা খানেক এমনি চালিয়ে লেখার সুর পালটে যায় হঠাৎ। হাসতে হাসতে কেঁদে পড়েছিল ঠিক কাঞ্চন, চিঠির পাতা নিবিখ করে খুঁজলে অশ্রুচিহ্ন বুঝি পাওয়া যাবে—

ভাই মঞ্জুলা, এবারের কলকাতা যাওয়া সার্থক। বড় উপকার হয়েছে, মানুষ চিনে এলাম ভাল করে। অন্ততপক্ষে দুটি মানুষ। একজন হলেন এই গ্রামের পোস্টমাস্টার নিরঞ্জন। উঁহু, পরিচয় পূর্ণ হল না—তাঁর জীবনই এই দুধসর গ্রাম। এমন মানুষের বিরুদ্ধে দরখাস্ত হয়েছিল, আমিই তার প্রধান উদ্যোক্তা। ডাকের চিঠি পড়েন তিনি, এবং প্রয়োজন মতো চিঠি ছিঁড়ে নিশ্চিহ্ন করেন। ইনস্পেক্টর এসে এক-গাঁ লোকের মধ্যে তাঁর বিচার করে গেল। আমি তখন কলকাতায়। অঞ্চল জুড়ে জেনে গেছে, এমন খারাপ মানুষ আর দ্বিতীয় নেই।

চিঠি পড়া এবং ছিঁড়ে ফেলা—অভিযোগ কতদূর সত্যি, দরখাস্ত করা সত্ত্বেও মনে মনে সংশয় ছিল আমার। কলকাতা থেকে এবারে অকাট্য প্রমাণ নিয়ে ফিরেছি—সত্যিই অপরাধী তিনি। চিঠি পড়েন

ও ছিঁড়ে ফেলেন। দাদা চলে গেল—দুঃসংবাদের সেই চিঠি খুলে পড়েছিলেন নিরঞ্জনদা, পড়ে গাপ করলেন। পরের চিঠি পড়া পরের গোপন কথা লুকিয়ে শোনার মতোই অন্যায়। অন্যায়ের শাস্তিও নিতে হচ্ছে এখন অবধি। চার টাকা মাইনের পোস্টমাস্টারকে মাসে মাসে ঠিক নিয়মে দশটাকা করে বাবার হাতে পৌঁছে দিচ্ছেন। দাদাই যেন মনিঅর্ডার করে পাঠিয়েছে। চিরকাল দিয়ে যাবেন এমনি। আমার বয়ে গেছে—আমি কোনোদিন কিছু জানতে যাব না। বাবাও জানবেন না। দাদা নিরঞ্জনদার বড্ড আপন ছিল, দাদার জায়গা নিয়ে আমার বাবাকে পুত্রশোক থেকে রক্ষা করেছেন তিনি। কলকাতায় গিয়ে খোঁজখবর না করলে আমিও টের পেতাম না, বেঁচে নেই আমার দাদা।

দাদার চিঠি পাইনে, রাণীশঙ্করী লেনের চিঠি আসে না—আক্রোশটা ছিল আমার সে-ই। দাদা চিঠি লেখেনি, কোনোদিনই লিখবে না আর। রাণীশঙ্করী লেনের চিঠি ইহজন্মে যেন আর না পাই, পেলে এবার থেকে আগুনে ফেলব। কলকাতা গিয়ে নিরঞ্জনদাকে যেমন চিনেছি, সমর গুহর আসল মূর্তিও তেমনি ভাল করে জানলাম। মানুষ নয় ওটা - গ্রামোফোন-রেকর্ড। একই কথা সকলের কাছে সুর করে বাজিয়ে যায়। তোষণ করে কাজ হাসিল করে। মন বলে বস্তুই নেই —তাই কোনোটাই ওর মনের কথা নয়, শুধুমাত্র মিষ্টি কথা। তোকে শুনিয়েছে, আমায় শুনিয়েছে, অর্পিতাকে শোনাচ্ছে। বুদ্ধিমতী তুই মঞ্জুলা, দু-পাঁচ দিনে চালাকি ধরে ফেললি। আমিও বড় বাঁচা বেঁচে গিয়েছি—মামার-বাড়ি ছেড়ে ভাগ্যিস গাঁয়ে এসে উঠতে হল। অর্পিতাকে সামাল করে দিয়ে এসেছি তারই ভালর জন্য। বেচারি সেই রোগে ভুগছে, তোর, আমার এবং আরও কতজনকে একদা যে রোগে ধরেছিল। সমরের চিঠি পাইনে বলেই নিরঞ্জনদার বিরুদ্ধে আরো ক্ষেপে গেলাম। কিন্তু মামার চাকরি গেছে এবং চোখের অন্তরাল হয়েছি আমি, তারপরে ও-মানুষ রাখতেই পারে না চিঠির সম্পর্ক।

আর নিরঞ্জনদা তার চিঠি সত্যিই যদি নষ্ট করে থাকেন, কৃতজ্ঞ আমি তাঁর কাছে। রাক্ষসের গ্রাস থেকে বাঁচাতে গিয়েছিলেন। অথচ সেই মানুষ লাঞ্ছিত হলেন—আমি তার পয়লা নম্বরের পাণ্ডা।

আচ্ছা মঞ্জুলা, আমি এখন কী করি বল্ তো। মানুষটির দু-পায়ে মাথা গুঁজে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। তাতে খানিকটা প্রায়শ্চিত্ত হবে। সত্যিই যদি তাই করে বসি, তিনি কি লাথি মেরে সরিয়ে দেবেন? না, কিছুতেই নয়। দেখে দেখে ধারণা হয়েছে, মানুষকে কষ্ট দেবার ক্ষমতাই নেই তাঁর। সাহস আমারই তো হবে না—লোকে কি বলবে, তিনিই বা কি ভাববেন!

চিঠি লিখতে লিখতে আবোলতাবোল ভাবনা মনে আসে। ভাবনার মুখে লাগাম পরানো যায় না। ভাবতে ভালো লাগছে, এই চিঠি কোনোক্রমে পড়ে ফেললেন সেই মানুষটি। বাবার কাছে এসে বললেন, বেণুধরের মতন আর এক ছেলে হতে চাচ্ছি আপনার।—কিন্তু অত হাঙ্গামে কাজ নেই, পুরুষ হলেও লজ্জা করে বই কি! কিছুই বলতে হবে না, আমি এই লিখে দিচ্ছি—শুধু আসবেন বাবার কাছে, এসে নিঃশব্দে একটি প্রণাম করবেন। তাইতে আমি বুঝে নেবো—সমস্ত দায়ভার তারপরে আমার উপর। মনস্থির করে ফেলেছি ভাই মঞ্জুলা। চিঠি এই ডাকবাক্সে ফেলছি—প্রত্যাশা করে থাকব, আজ কাল আর পরশু তিন দিনের মধ্যে কোন এক সময় তিনি বাবার কাছে এসে যাবেন।

খামের চিঠি, জল দিয়ে কোন রকমে রীতরক্ষার মতো এঁটেছে। দক্ষ পোস্টমাস্টার—অন্যান্য কাজে কেমন জানা নেই, কিন্তু খাম খোলা ও আঁটার ব্যাপারে পরিপাটি রকমের হাত-সাফাই। এই খামের মুখ ছুটো নখে ধরে একটু টানলেই তো খুলে যাবে। পাঁচ বছরের শিশুও পারে।

তিনদিনের কড়ার, কিন্তু পুরো হপ্তাই কেটে গেল। কাঞ্চন ওকে

তক্কে আছে। মানুষের সাড়া পেলে ভাবে, নিরঞ্জনই বুঝি—শৈলধরকে প্রণামের জন্য এসেছে। ঘরে থাকলে তাড়াতাড়ি দরজার পাশে এসে অলক্ষ্যে ঠাহর করে। ইস্কুলের পর বাড়ি এসে জিজ্ঞাসা করে : কেউ এসেছিল বাবা তোমার কাছে ? কাকস্য পরিবেদনা !

হপ্তা পরে মঞ্জুলার জবাব এসে পৌঁছল। খাম উল্টেপাল্টে দেখে কাঞ্চন। খোলা হয়েছে তার চিহ্নমাত্র নেই। পড়েনি এ চিঠি নিরঞ্জন। গর্ব হওয়ার কথা বটে - এক দরখাস্তে মানুষটার শাসন হয়ে গেল। সবসমক্ষে নিরঞ্জন যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, অক্ষরে অক্ষরে মানছে সেটা।

মঞ্জুলার চিঠির মধ্যেও সেই প্রতিশ্রুতি-পালনের কথা। তোর কাছে শোনা ছিল কাঞ্চন—খাম খোলার আগে ভাল করে তাই দেখে নিলাম। কক্ষনো খোলেনি তোর চিঠি—মানুষটার নামে মিছামিছি তোরা বদনাম দিস। পায়ে ধরে ক্ষমা চাইবি। যে-কথা তুই লিখেছিস—আলুল চুলের গোছা দিয়ে সত্যি সত্যি গেঁয়ো মানুষটার পায়ের কাদা মুছে দিবি। লাথির ভয় করিসনে, পুরুষ হয়ে তোর মতন মেয়েকে কেউ লাথি মারে না, বরঞ্চ অন্য রকম করে। কাঠ-পাথর হলে অবশ্য আলাদা কথা। আর সত্যি সত্যি মারেও যদি, পাপমুক্ত হয়ে তুই তো উদ্ধার হবি ভাই।

চিঠি খামে ভরে রাগে গর-গর করতে করতে কাঞ্চন নিরঞ্জনের কাছে গিয়ে পড়ে : চিঠি খুলে কেন আপনি পড়লেন ?

ঘাড় নিচু করে নিরঞ্জন কাজ করছিল। অবাক হয়ে তাকাল।

চিঠি চোখের উপর ধরে কাঞ্চন বলে, মঞ্জুলার এই চিঠি—

কে বলেছে, কেমন করে জানলে তুমি ? আকাশ থেকে পড়ে নিরঞ্জন : কখনো না, কখনো না। অনেক তো হয়ে গেছে রেহাই দাও এবারে। চিঠি পড়িনি, কোনো চিঠিই পড়ব না আর কোনো দিন।

কাঞ্চন গর্জন করে উঠল : কেন পড়বেন না তাই জিজ্ঞাসা করি ?

ভয় পেয়ে ? শরীরের রক্ত জল করে দু-হাতে পয়সা ছড়িয়ে কে গড়ে তুলেছে পোস্টাপিস। আজেবাজে লোকে কোথায় কি নিন্দেমন্দ করল, তার জন্যে হাত-পা গুটিয়ে অমনি ঠুঁটো-জগন্নাথ হয়ে গেলেন! ছিঃ ছিঃ—

শুধু মুখের নিন্দেমন্দই নয় কাঞ্চন, হেড-অফিস অবধি দরখাস্ত পড়েছিল। তদন্তের দিন তুমি ছিলে না—পোস্টাপিস উঠে গিয়ে গ্রামের বেইজ্জতির অবস্থা।

অবাক হয়ে নিরঞ্জন কাঞ্চনের রোষরক্ত মুখের দিকে তাকায়। বলে, রাগ করছ, কিন্তু তুমিই তো পয়লা নম্বরের পাণ্ডা। দরখাস্ত সবাই দেখেছে। তোমার নাম সকলের আগে, হাতের লেখা তোমারই।

কাঞ্চন বিন্দুমাত্র লজ্জিত নয়। সমান তেজে বলে, হবেই তো! মানুষ চিনলাম কবে, মায়ামমতা আসবে কিসে? শহরের উপর মামার-বাড়িতে মামার টাকায় নেচেকুঁদে বেড়িয়েছি। আর বড় বড় বুলি শিখেছি কতকগুলো। কিন্তু গাঁয়ের মানুষ আপনি কেন শহুরে কাঠখোট্টা আদব মানতে যাবেন? আমাদের সঙ্গে আপনার তবে তফাত রইল কোথা?

ম্লান হাসি হাসল নিরঞ্জন: দশের মধ্যে হলপ করে বলেছি, পোস্টাপিস বজায় থাকবে, আমিই আর মানুষ থাকব না।

ঠিক তাই। আপনি আর মানুষ নন নিরঞ্জনদা, চার তঙ্কা মাইনের পোস্টমাস্টার। হাত পেতে সেই মাইনে নেওয়া, আর তুখসর পোস্টাপিসের গবর নিয়ে বুক ফুলিয়ে বেড়ানো—এ ছাড়া সমস্ত-কিছু গেছে আপনার।

চোখে আঁচল দিয়ে কাঞ্চন ছুটে পালাল।

॥ পনের ॥

মামা জগন্নাথ চৌধুরীর চিঠি। দুর্দিনে সেই যে কলকাতা ছেড়ে দুধসর চলে এলো, তারপরে মামা এই প্রথম লিখলেন ভাগনীকে। নিরঞ্জন যথানিয়মে শৈলধরের বাড়ি চিঠি বিলি করে চলে গেল।

হাতের লেখা চিনতে পেরে কাঞ্চন তাড়াতাড়ি খাম খুলে পড়ছে। আনন্দের খবর—এতবড় খবর যে বিশ্বাস হতে চায় না। আগাগোড়া বার দুয়েক পড়ে সে মুখ তুলল। চিঠি দিয়ে নিরঞ্জন ততক্ষণে মোড় অবধি চলে গেছে। আনন্দ না শুনিয়ে পারে না, জোর গলায় কাঞ্চন ডাকছে : শুনে যান নিরঞ্জনদা। কী চিঠি দিয়ে গেলেন জানেন না —দুধসর ছেড়ে চলে যাবার চিঠি।

চকিতে নিরঞ্জন ফিরে দাঁড়াল। সত্যি, না ভয় দেখাচ্ছে? পায়ে পায়ে উঠানে এলো আবার। না, এতখানি উল্লাস ভাঁওতা বলে মনে হয় না। খোলা চিঠি এগিয়ে ধরে কাঞ্চন বলে, পড়েই দেখুন না। ডাক এসেছে, কলকাতায় চলে যাবো।

চিঠির দিকে নিরঞ্জন ফিরেও তাকায় না। হতভম্ব হয়ে আছে। হেসে হেসে কাঞ্চন বলে, কী সুবিধা হয়েছে, কেমন শাসন করে দিয়েছি! আগের দিন হলে এমন চিঠি কক্ষনো হাতে এসে পৌঁছত না, অগ্নিদেবের জঠরে যেত। বসুন। সুখবর এনে দিলেন, মিষ্টিমুখ করাবো। ক্ষীর-কাঁঠাল খেয়ে যান।

বালিকা-বিদ্যালয়ের সেক্রেটারিও নিরঞ্জন। হঠাৎ সে চাঙ্গা হয়ে উঠে ধমক দিয়ে বলে, দেখ, ইস্কুল ছেলেখেলার জিনিস নয়। সেই একবার হুট করে বেরিয়েছিলে। নিয়ম মাফিক একটা দরখাস্ত চুলোয় যাক, সেক্রেটারিকে মুখের কথাটাও বলোনি। শিক্ষক বলতে তুমি এক-জন মাত্তোর—বালিকা-বিদ্যালয় বন্ধ দিতে হল। কিসের বন্ধ নাম খুঁজে পাইনে—বলি গ্রীষ্মের বন্ধ তো হয়ে থাকে, আমাদের এটা শীতের বন্ধ।

বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়েছে, সে লক্ষণ নয়। হাসছে তেমনি কাঞ্চন। তর্জন ছেড়ে তখন তোয়াজ : এতগুলো মেয়ের ভবিষ্যৎ তোমার উপর। কত দায়দায়িত্ব, কত বড় ক্ষমতা—এক ইস্কুল-মেয়ে তোমার কথায় ওঠে বসে। মাইনে থেকে এ জিনিসের মূল্যবিচার হয় না।

তবু কাজ হয় না দেখে ভড়কে গেছে এবারে নিরঞ্জন। চাকরি হল নাকি কলকাতায়? সকাতরে বলে, একলাটি তোমার কষ্ট হচ্ছে বুঝতে পারি। এইসা দিনে নহি রহেগা। মেয়ে বাড়ছে, বিদ্যালয় ধাঁ-ধাঁ করে বড় হয়ে যাবে। শিক্ষক আরও এনে ফেলছি। হাতের কাছে একটি তো মজুতই আছে— রাখালের বোন ললিতা। বলছিল সে চাকরির কথা। মাথার উপরে হেডমিস্ট্রেস তুমি—মাইনেও বেড়ে যাবে। তাই বলি, ছটফটানি ছেড়ে দাও, বাইরের দিকে চোখ দিও না।

কাঞ্চন বোমা নিক্ষেপ করল একেবারে। বলে, কলকাতায় এবারে দু-দশ দিনের জন্য নয়। কাজ ছেড়ে দিয়ে পাকাপাকি চলে যাবি। মামাবাড়ির ভাগনী হয়ে থাকব, আগে যেমন ছিলাম। বাবা আর আমি দুজনেই যাচ্ছি, দুধসরে আর থাকব না।

এমনি বলে নিরঞ্জনকে একেবারে পাতালে বসিয়ে কাঞ্চন ফরফর করে ঘরে ঢুকে গেল। বোধ করি ক্ষীর-কাঁঠাল আনতে। কাঁঠাল তো বিষ এখন—তবু বসতে হল, চটানো যায় না এই অবস্থায়। ক্ষীর-কাঁঠাল না দিয়ে বিষ দিলেও সোনামুখ করে সে জিনিস খেয়ে যেতে হবে।

নিরঞ্জনকে বলল কাঞ্চন এই সমস্ত, কিন্তু মামার চিঠির জবাব দিল একেবারে ভিন্ন রকম :

অঘ্রান মাসে মঞ্জুলার বিয়েয় গিয়ে অনেক দিন কাটিয়ে এসেছি। সামান্য আয়োজনের ইস্কুল আমাদের—দেখতে দেখতে বড় হয়ে উঠছে। সমস্ত দায়িত্ব একলা আমার উপর, শিক্ষয়িত্রী বলতে একলা আমি। আমি চলে যাবার পর ইস্কুল বন্ধ দিতে হয়েছিল। আবার

এখন সেই জিনিস হলে গার্জেনরা মেয়ে পাঠানো বন্ধ করে দেবে, উঠে যাবে ইস্কুল। অঞ্চলের মানুষ টিটকারি দেবে। বিশেষ করে পাশের গ্রাম সুজনপুর—ঐ সুজনপুর নিয়েই ভয়টা আমাদের বেশি। হাসাহাসি করবে তারা—

এমনি অনেক কথা। মামাকে অনেক রকমে বুঝিয়েছে, তুধসব ছেড়ে কলকাতা গিয়ে ওঠা আপাতত অসম্ভব তার পক্ষে।

উত্তরে জগন্নাথ কড়া করে লিখলেন: পাড়াগাঁয়ে যখন আর থাকবিনে, সুজনপুর হাসল কি কাঁদল কি যায় আসে তোর? চুলোয় যাকগে বালিকা-বিদ্যালয়। পনের টাকার মাস্টারনি হয়ে জনম খোয়াবি, সেইভাবে কি মানুষ করেছি তোকে?

খেয়ালি মেয়ের মতিগতি কেমন দুর্বোধ্য ঠেকছে। ভাগনীর উপর নির্ভর না করে জগন্নাথ শৈলধরকেও আলাদা চিঠি দিলেন: কাঞ্চন আর তুমি অবিলম্বে চলে এসো। মহাসুখে থাকবে এখানে। হড্ড-হড্ড করে ঘোরা অথবা হাত পুড়িয়ে নিজে রান্না করে খাওয়া—এই তো করে গেলে চিরকাল। বুড়োবয়সে সে জিনিস আর পোষাবে না। সেইজন্যে তোমাকেও আসবার জন্য বলছি। শহরের পাকাঘরে থেকে নির্গোলে ভগবানের নাম নেবে, আর শেষদিনে মা-গঙ্গায় দেহ রাখবে, এর বেশি কি চায় মানুষে?

জ্যোৎস্নাও কাঞ্চনকে ইনিয়ে-বিনিয়ে লিখছেন: কষ্টের দিন শেষ হয়েছে মা। বস্তিতে পড়ে ছিলাম আমরা—তুই যেখানে আছিস, তা-ও বস্তির চেয়ে ভাল কিছু নয়। চলে আয় নিজের জায়গায়। তুই না থাকায় ঘরবাড়ি খা খাঁ করছে।

চিঠিপত্র নিরঞ্জন নিজ হাতে নির্বিকারভাবে দিয়ে যাচ্ছে। চিঠি ডাকে এসে পৌঁছলেই বিলি করে, এবং যত কিছু ডাকবাক্সে পড়ে নিয়ম মাফিক মেলব্যাগে ঢুকিয়ে দেয়। কে লিখল চিঠি, কী তার মর্ম—পোস্টমাস্টারের এক্তিয়ারের বাইরে এসব। আগেকার দিন হলে হাতের উপর দিয়ে সর্বনাশা জিনিসের চলাচল কখনো হতে পারত না।

রাহুমুক্ত হয়ে জগন্নাথ চৌধুরী বেরিয়ে এসেছেন। হাইকোর্টে প্রমাণ করে দিয়েছেন, বিরাট ষড়যন্ত্র তাঁর পিছনে। সমস্ত চার্জ থেকে বেকসুর খালাস। কোম্পানির ডিরেক্টর বদল হয়েছে ইতিমধ্যে, কর্মদক্ষ প্রবীণ অফিসার জগন্নাথের সঙ্গে তাঁরা মিটমাট করে নিয়েছেন। এতদিনের প্রাপ্য মাইনে সুদসমেত পেয়ে গেছেন জগন্নাথ। কিছু ক্ষতিপূরণও। এবং চাকরিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠা, পূর্বের মতন খাতির ইজ্জত।

লজ্জায় এ যাবৎ মুখ দেখাতেন না জগন্নাথ। বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে কানাগলির বস্তিতে ঢুকে পড়েছিলেন। মামলার তদ্বির ছাড়া দ্বিতীয় কর্ম ছিল না অহোরাত্রির মধ্যে। আজকে রণজয়ী বীর। আবার সব ফিরেছে। পৈতৃক বাড়িটা ফেরত পাবার উপায় নেই, কিন্তু নতুন যে বাড়ি সংগ্রহ করেছেন সেটা বেশি চমকদার আগের বাড়ির চেয়ে।

চিরকাল জগন্নাথ জাঁকজমক ভালবাসেন। একটা কলঙ্কের ছায়ায় আত্মগোপন করেছিলেন, তার শোধ তুলে নিচ্ছেন ডবল জাঁকজমক দেখিয়ে। ঝি-চাকর আগের আমলে যা ছিল, এবারে বহাল হল অনেক বেশি তার চেয়ে।

আত্মীয়স্বজন আশ্রিত-প্রতিপাল্য যত ছিল, সুদিন পেয়ে সকলের খোঁজ পড়েছে। ভাগনে বেণুধর আর আসবে না, বড় কষ্ট পেয়ে গেছে সে। কাঞ্চন দুর্গম গাঁয়ের মধ্যে মুখে রক্ত তুলে খেটে মরছে। সেজন্য চিঠির পর চিঠি : তোদের নিয়েই আমার যা-কিছু। 'তোদের' বলি কেন আর—সন্তান বলতে তুই একলা। কেন মিছে দেরি করছিস মা, চলে আয়—

কাঞ্চন গা করে না তো শৈলধরকে লিখলেন, চুকিয়ে বুকিয়ে তাড়াতাড়ি মেয়ে নিয়ে চলে এসো। বিয়ে দিতে হবে না কাঞ্চনের কোন দুঃখে গাঁয়ে পড়ে আছ, রাজার হালে থাকবে এখানে।

শৈলধর তো এক-পায়ে খাড়া। কিন্তু জেদী মেয়ে—ক্রমাগত বাগড়া দিচ্ছে। বলে, ইস্কুল ?

গা জ্বালা করে কথা শুনে। শৈলধর খিঁচিয়ে উঠলেন : কাজে ইস্তফা দিয়ে দে। তার পরে যা পারে ওরা করুকগে।

হয় না বাবা। কত কষ্ট করে ইস্কুল জমিয়েছি, চোখেই তো দেখেছ সব। ঘরের কাজকর্ম থেকে ছাড় করিয়ে ইস্কুলে মেয়ে টেনে আনা চাট্টিখানি কথা নয়। তর্ক করতে করতে মুখে ফেনা উঠে গেছে। সেইসব গার্জেন কি বলবে এখন—তাদের কাছে জবাবটা কি দেবো ?

শৈলধর বলেন, নাগালের মধ্যে পেলে তবেই তো বলাবলি। চাকরি ছেড়ে হুধসরের মুখে লাথি মেরে বেরিয়ে পড়বি। থুতু ফেলতেও আমরা আর আসব না।

কাঞ্চন চুপ করে আছে।

অধীর উৎকণ্ঠায় শৈলধর বলেন, কি বলিস রে ? জগন্নাথ কত করে লিখেছে—দায়ে বেদায়ে আপন বলতে ঐ একজন। ছেলেপুলে নেই, তুই ওদের সমস্ত। মামা-মামীর মন বিগড়ে যায়, কদাপি এমন কাজ করবিনে।

ভাবল একটুখানি কাঞ্চন। ভেবেচিন্তে নরম সুরে বললে, দেখি ওঁদের বলেকয়ে—

মুখে বলা নয় একেবারে দরখাস্ত নিয়ে হাজির সেক্রেটারি নিরঞ্জনের কাছে।

নিরঞ্জন বলে, কি ওটা ?

পড়ে দেখুন। চাকরিতে ইস্তফা দিচ্ছি।

নিরঞ্জন ব্যাকুল হয়ে বলে, কী সর্বনাশ ! যা বললে সত্যি সত্যি তাই ?

কষ্ট হয় মানুষটার মুখের দিকে চাইলে। চোখ নিচু করে দাঁড়িয়ে কাঞ্চন নিঃশব্দে পায়ের নখে মেজেয় দাগ কাটছে।

এমনি করে ভাসিয়ে যাবে তো কষ্ট করে গড়ে তুললে কেন জিনিসটা ? একটা কুকুর-বিড়াল পুষলেও মানুষের মায়া পড়ে যায়, ছাড়তে আগুপিছু করে—

মনের ক্ষোভে একটানা বলে যাচ্ছে, কাঞ্চন বাধা দিয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে, আমি গেলে কী—মাস্টারনি তো হাতের কাছেই মজুত আপনার।

নিরঞ্জন খেয়াল করতে পারে না। কাঞ্চনই ধরিয়ে দিল: ললিতা, পিওনমশায়ের মেয়ে—

তোমায় বলেছিলাম বটে সেদিন। মেয়েটা কাজের জন্য বলছিল। তা সত্যিকথা বলি—তোমার ছটফটানি দেখে ভাবিনি যে তার কথা এমন নয়। কিন্তু মুশকিল আছে—সুজনপুরের মেয়ে সে, শত্রু-গাঁয়ের মেয়ে। খাতির যতই থাক, ষোলআনা আস্থা তার উপর রাখা যায় না। ঘাতঘোঁত বুঝে নিয়ে নিজের গাঁয়েই হয়তো ইস্কুল খুলে বসল। নীলমণিও সেই কথা বলে—ললিতা আসবে তো কায়দা করে আষ্টেপিষ্টে বাধ দিয়ে তাকে আনতে হবে। পরিণামে সরে পড়তে না পারে।

যত কিছু করতে হয়, করে নিন। আমি তার জন্যে আটক হয়ে থাকতে পারিনে?

কিছু বিরক্ত হয়ে নিরঞ্জন বলে, আষ্টেপিষ্টে বাধার মানে হল বিয়ে। এ-গাঁয়ের বউ করে আনতে হবে। তখন আর সুজনপুরের মেয়ে থাকবে না—ডুধসরের বউ। তা 'ওঠরে ছুঁড়ি' বলে বিয়েথাওয়া হয় না, সময় দিতে হবে। চোত মাস সামনে, অকাল পড়ে যাচ্ছে। নিদেনপক্ষে বোশেখটা তো আসতে দাও—

দরখাস্ত নিরঞ্জনের হাতে গুঁজে দিয়ে কাঞ্চন ফিরল। শৈলধর মুকিয়ে আছেন, সম্ভব হলে এই মুহূর্তে বেরিয়ে পড়েন। কাঞ্চন এসে ঘাড় নাড়ে: গ্রীষ্মের বন্ধের আগে ছাড় হচ্ছে না বাবা। সে তো এসেই গেল—চুপচাপ থেকে যাই এই ক'দিন। গ্রামসুদ্ধ লোকের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ ঠিক হবে না। মামাকে লিখে দিচ্ছি সেই কথা।

অগত্যা তাই। গ্রীষ্ম অবধি অপেক্ষা না করে উপায় নেই। ছুটি পড়ে গেলে অনেকটা নির্গোলে বেরোনো যাবে। 'ফিরে আসব'

—মিছামিছি বলে যেতেও অসুবিধা নেই। শুধু সতর্ক হয়ে থাকা, মেয়ের মত না ঘুরে যায় ইতিমধ্যে।

চৈত্রমাস পড়তে শৈলধর তাগিদ শুরু করলেন : মাঠের মাটি ফেটে চৌচির ; ঘাটের পৈঠা দুপুরবেলা আগুন হয়ে ওঠে—পা রাখা যায় না তার উপর। এর বেশি গ্রীষ্ম কি হবে, দিয়ে দে বন্ধ এইবার। দিয়ে বাপে-মেয়েয় বেরিয়ে পড়ি।

কাঞ্চন হেসে বলে, এখনই কী বাবা, সে হবে মে মাসের মাঝামাঝি। বন্ধ দেবার মালিকও আমি নই। মাথার উপরে সেক্রেটারি আছেন নিরঞ্জনবাবু, প্রেসিডেন্ট আছেন অজয়বাবু। কমিটি আছে। আমি তো মাইনে-খাওয়া কর্মচারী মাত্র।

তাই তো বলি মা। পনেরটি টাকার জন্য সারা দিন ভ্যাজর-ভ্যাজর করে মুখে রক্ত তুলিস, আর তোর মামা ঝি-চাকর কত জনাকে এই মাইনে দিচ্ছে। বেশিও দেয়।

কাঞ্চন পুরনো কথা তোলে : কাজ তো নিতে চাইনি বাবা। ঝগড়া করে হুকুম করে তুমিই চাপিয়েছিলে ঘাড়ে আমার—

হাতী সেদিন হাওড়ে পড়েছিল যে। দিন ফিরেছে বলেই কাদা-জল ধুয়েমুছে পালাতে চাচ্ছি।

কিন্তু যত অধৈর্যই হন, যেতে হবে মেয়েকে গ্রাম থেকে উদ্ধার করে নিয়ে। জগন্নাথ শৈলধরকেও কলকাতায় আহ্বান করেছেন যেহেতু কাঞ্চন নামে মেয়েটির পিতা তিনি। কাঞ্চনকে বাদ দিয়ে তাঁর কোন মূল্যই নেই।

বন্ধের দিন এগিয়ে আসে। এই সময় একদিন নিরঞ্জন এসে ধরে পড়ল : থেকে যাও না গো। বেশ তো আছ—কলকাতায় গিয়ে দুটো সিং গজাবে নাকি ?

বলবার এই ধরন। আগের দিনে হলে রাগ করত কাঞ্চন, এখন

কৌতুক লাগে। হাসিমুখে প্রশ্ন করে: বলছেন নিজের পক্ষ থেকে না গ্রামের পক্ষ থেকে?

আমার একার কথায় কতটুকু জোর! গ্রামের পক্ষ থেকে বলছি। ভেবে দেখলাম, তুমি না থাকলে বালিকা-বিদ্যালয়ের বড় মুশকিল।

কেন, ললিতা?

নিরঞ্জন বলে, বলেছি তো সেকথা। বাধন-কষণ দিয়ে বিধিমত ব্যবস্থা করে তবে আনতে হবে সে মেয়ে। তার কোন উপায় করা যাচ্ছে না। ছোঁড়াদের কত জনাকে বলেছি। এমন গুণের মেয়ে—কিন্তু একটা চোখ নেই, খুঁতটা চাউর হয়ে গেছে। কাউকে রাজী করানো যাচ্ছে না। যেন বিয়ে করে গুণী মেয়েকে নয়—মেয়ের হাত-পা চোখ-কানগুলোকে। সর্বঅঙ্গ ষোলআনা মিলিয়ে নিয়ে তবে বউ ঘরে তোলে।

তারপর অনুনয়ের কণ্ঠে বলে, ভেবেচিন্তে দেখছি, তোমায় ছাড়া চলবে না। আরম্ভ থেকে আছ তুমি, নিজ-হাতে জিনিসটা গড়ে তুললে, তোমার মতন প্রাণ-ঢালা কাজ কে করবে?

এমন প্রশংসার কথাতেও কেন জানি কাঞ্চন ক্ষেপে যায়। বলে, যাবোই আমি। শেষ কথা আমার, পচা-গাঁয়ে পড়ে থেকে জীবন খোয়াব না। এক মাস ইস্কুল বন্ধ থাকবে, তার মধ্যে বন্দোবস্ত করে নেবেন। না পারলে নাচার।

নিরঞ্জন নিঃশব্দে ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে রইল। ব্যথিত কণ্ঠে তারপর বলে, সারা গাঁয়ের কথা আমার একলার মুখে জোরদার হল না। বলিগে তাই। সবসাধারণের কাজ যখন, সকলে মিলে করুন।

শিউরে উঠে কাঞ্চন বলে, আটকাবেন নাকি সকলে মিলে?

কী জানি! উদাসীন কণ্ঠে নিরঞ্জন বলে, হয়েছে অবশ্য তেমনি ব্যাপার। হাইকোর্টের অমন যে বাঘা-উকিল, তাঁকেও রেহাই দেয় নি। সে তো চোখের উপর দেখেছ।

জোর করে আটক করবেন ?

জিভ কেটে শশব্যস্তে নিরঞ্জন বলে, সে কী কথা ! জোর নয়, গ্রামবাসী সকলের আবদার। শুধসরে মানুষ এসে পড়লে লুফে নিয়ে কাঁধে তোলে, গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়াটা বড় কঠিন।

ঘাবড়ে গিয়ে কাঞ্চন শৈলধরকে বলল, শাসিয়ে গেল বাবা, সবশুদ্ধ এসে পড়বে। পুবগুয় সরকারের বেলা যা হয়েছিল, তেমনি দশা ঘটবে।

লক্ষণ তাই বটে। বিজয়ে-নিরঞ্জনে এত বিরোধ—নিরঞ্জনকে জব্দ করতে কাঞ্চনের সঙ্গে মিলে বিজয় দরখাস্ত করেছিল। এখন উল্টো—ওরা দুয়ে জুড়ি হয়ে কাঞ্চনের যাওয়া পণ্ড করতে লেগেছে।

শৈলধরের উপর বিজয় ঔর্মকি দিয়ে পড়ল : মেয়ে নিয়ে সরে পড়ছেন ?

শৈলধর বলেন, নতুনটা কি হল ? ছিলই তো চিরদিন মামার-বাড়ি। অবস্থার ফেরে এসে পড়েছিল—দিন ফিরেছে, মামা আবার ডাকছে।

বিয়েথাওয়ার কথাবার্তা চলছিল যে—

শৈলধর একগাল হেসে বলেন. আমার উপরে আর কিছু রইল না বাবা। মামার কাঁধে সব দায়িত্ব। মামা-মামী পছন্দ করে যেখানে হোক দিয়ে দেবে। অবস্থার বিপাকে মাঝে একটু গোল-মাল ঘটেছিল, নয়তো বরাবরই এইরকম কথা।

বিজয় মারমুখি হয়ে ওঠে : তা হলে আমায় নিয়ে কি জন্যে বানর-নাচ নাচালেন ?

বলবার কথা শৈলধর হঠাৎ ভেবে পান না। বলেন, বানর বলে নিজেকে ছোট করছ কেন ? কায়দা পেয়েছিলাম, হয়েই তো যেত—তোমার মা বাগড়া দিয়ে দেরি করিয়ে দিলেন। তা মনে রইল তোমার কথা—পাত্র ঠিক করার সময় তোমার নাম নিশ্চয় উঠবে। আমি সেটা করব।

স্তোক দিয়ে অনেক করে বিজয়কে খানিক ঠাণ্ডা করা গেল। কিন্তু শেষ নয়। গ্রামবাসী অনেকে আসছে খবরের সত্য-মিথ্যা যাচাই করতে। বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট অজয় সরকার একদিন এসে উপস্থিত প্রবীণ মুরুব্বি কয়েকজন সঙ্গে নিয়ে। অভি-ভাবকের মধ্যেও পড়েন এঁরা।

অজয় বলে, ইস্কুলের সঙ্গে বাবার নাম যুক্ত রয়েছে। ইস্তফা দিয়ে যাওয়া মানে সবংশে আমাদের ডুবিয়ে যাওয়া। গাঁ-সুদ্ধ অপদস্থ করা। মাথাপাগলা মানুষ নিরঞ্জন—একটা না একটা খেয়াল নিয়ে মেতে থাকে। ইস্কুলের খেয়াল কাঞ্চনকে না পেলে দুদিনেই জুড়িয়ে যেত। ছেড়েছুড়ে শহরেই যদি উঠবে, এদূর তবে এগোনো কেন? কোথায় গেল আপনার মেয়ে—তার কাছে জিজ্ঞাসা করতে এসেছি।

শৈলধর বলেন, চাকরি নিয়ে আমার মেয়ে এমন দাসখত লেখেনি যে সারাজন্ম করে যেতে হবে, কোনো দিন ছাড়ান পাবে না।

আরও ক্ষেপে গিয়ে অজয় বলে, চাকরিটা কোথায় শুনি। চাকরি মানে দিনগত পাপক্ষয়—সর্বলোকে যা করে থাকে। দশটায় গিয়ে পড়িয়ে-শুনিয়ে চারটেয় বাড়ি এসে উঠল—ব্যস, ইতি। তেমন হলে বলবার কিছু ছিল না। এই এঁরা সব এসেছেন—জপিয়েজাপিয়ে এঁদের ঘরের মেয়েগুলো ইস্কুলে নিয়ে তুলেছে। কাজটা আপনার বিদ্যাদিগগজ মেয়ে ছাড়া অন্য কারো সাধ্যে হত না। বাচ্চা-বাচ্চা মেয়ে গড়-গড় করে ইংরাজি পড়ে যায়—ইস্কুল উঠে গেলে কি করবে তারা এখন? শিলনোড়া নিয়ে ঝাল বাটতে বসে যাবে? আপনার সঙ্গে হবে না—কাঞ্চন কোথায়, ডেকে দিন একবার।

কাঞ্চন বাড়ি ছিল না। সর্বরক্ষে। থাকলে আরও খানিক বচসা হত। এই কাণ্ড চলছে নিত্যদিন। গ্রামের কারো সঙ্গে দেখা হলে এই জিজ্ঞাসা। যাওয়ার কথাটা বড্ড চাউর হয়ে গেছে। বাইরেও

ছড়িয়েছে বেশ। সুজনপুরের লোক হলে হাসি-হাসি মুখে আসনাই দেয়ঃ বটেই তো! এমন সুযোগ-সুবিধা থাকতে ধাপধাড়া জায়গায় কে পড়ে থাকতে যাবে?

এরই মাঝে আবার একদিন নিরঞ্জনের সঙ্গে দেখা। বাড়ি পর্যন্ত আসেনি নিরঞ্জন, দেখাটা পথের উপর।

কি হলে থাকবে তুমি কাঞ্চন? তোমাকেই জিজ্ঞাসা করছি—জবাব দাও, কোন রকম উপায় আছে কিনা।

কাঞ্চন বলে, জবরদস্তিতে হবে না। উকিল মশায়ের বেলা যা হয়েছিল সে কৌশল এখানে খাটবে না? বুঝেছেন সেটা? শক্ত মেয়ে আমি।

কৌশল খাটিয়ে লাভও নেই। আমি ভেবে দেখেছি। থাকতে হলে মনের খুশিতে থাকবে, স্ফূর্তিতে ইস্কুল চালাবে। এদ্দিন যেমন চালিয়ে এসেছ। দেখতে দেখতে তাই এমন জমে উঠেছে। কিসে সেটা সম্ভব হতে পারে, খোলাখুলি বলে দাও।

হাসিমুখে কাঞ্চন বলে, যা চাইব দেবেন তাই?

বলো শুনি। সাধ্যপক্ষে নিশ্চয় দেবো।

মোটা মাইনে, ধরুন আড়াই-শ টাকা—

মাসে মাসে, না বছরে? হেসে উঠল নিরঞ্জন। ইস্কুল তোমারই। সেক্রেটারি-প্রেসিডেন্ট আমরা নৈবেদ্যের উপরের কাঁচকলা বই তো নই। বলো তো ছেড়ে দিচ্ছি। তোমার ইস্কুল যদ্দুর দিতে পারে, নিয়ে নাও তুমি—'না' বলতে যাবো না। ঠাট্টা নয়, বলো কি করতে পারি? ছটফটানি ছেড়ে চিরকাল যাতে থেকে যাও।

কাঞ্চন খেলার ছলে যদি এইবার বলে বসে, বর হয়ে বসো নিরঞ্জনদা, তোমায় বিয়ে করে কায়েমি হয়ে থেকে যাই—কোঁচানো ধুতি পরে মাথায় টোপর চাপিয়ে তক্ষুনি নিরঞ্জন বরাসনে বসে পড়বে, সন্দেহমাত্র নেই। নিরঞ্জন বলে কি—গাঁয়ের ছোঁড়াদের ভিতর যার দিকে চেয়ে ইশারা করবে, গুটগুট করে সেই লোক এসে বসবে। তার মধ্যে

বিজয় সরকার তো আছেই। বড্ড পশার ইদানীং কাঞ্চনের—কলকাতায় যাওয়ার নামে পশার বেড়ে আকাশচুম্বী হয়েছে। ইচ্ছে হলে অক্লেশে এখানে স্বয়ম্বর-সভা ডাকতে পারে। ডাকবে নাকি তাই একদিন?

হপ্তাখানেক গেল, বন্ধের দিন আরও এগিয়েছে। হঠাৎ কাঞ্চন পোস্টাপিসে এসে হাজির। সুজনপুর সাব-অফিসে ডাক রওনা হয়ে যাচ্ছে—নিরঞ্জন ভারি ব্যস্ত এখন।

দুমদুম করে ধরা কাঁপিয়ে কাঞ্চন সোজা ঘরে ঢুকে পড়ল। নো অ্যাডমিশন, ভিতরে আসিও না—চৌকাঠের মাথায় সরকারি নোটিশ লটকানো। কিন্তু কাঞ্চনকে আটকাবে কোনো নোটিশের বাপের সাধ্য নেই।

একখানা আঁটা-খাম কাঞ্চন নিরঞ্জনের হাতে দিল। সিল মেরে মেরে যাবতীয় চিঠিপত্র মেলব্যাগে ঢোকাচ্ছে, এ চিঠিতেও সিল মারতে গেছে—

মুখ তুলে নিরঞ্জন বলে, টিকিট দিয়েছ কই?

ভারি বেকুব হয়েছে যেন কাঞ্চন। তেমনি ধরনের মুখ করে বলে, তাই বটে! ভুল হয়ে গেছে, টিকিট পাই কোথা এখন? আপনার আবার নগদ কারবার, ধারবাকি বন্ধ করে দিয়েছেন। রইল চিঠি, বাড়ি থেকে টিকিটের দাম নিয়ে আসছি।

দাওয়ায় পড়ে হঠাৎ সে ফিরে দাঁড়াল। তীব্র কণ্ঠে বলে, সেদিন বলেছিলাম, মানুষ নন আর আপনি, আমাদের এক দরখাস্তের ঠেলায় পোস্টমাস্টার। ভুল হয়েছিল বলতে, বেশি মান দিয়েছিলাম। পোস্টমাস্টারও নন, শুধু এক ডাকবাক্স। ডাকবাক্সে না ফেলে চিঠি আপনার হাতে দিয়েছি—একই ব্যাপার। ডাকবাক্সের ভিতরে সব চিঠি একাকার, আপনার হাতেও তাই।

ফরফর করে চলল। টিকিটের পয়সা না আরো-কিছু, আড়াল হবার ছুতো। নীলমণি ডাক নিয়ে রওনা হয়ে গেছে, কাজকর্ম

মিটেছে। পোস্টাপিস একেবারে নির্জন, সেই সময় কাঞ্চন ফিরে এলো।

মুখ টিপে হেসে বলে, বিনা-টিকিটেও চিঠি যায় নিরঞ্জনদা। বেয়ারিং হয়ে ডবল মাশুল আদায় করে গ্রাহকের কাছে। বেয়ারিং যাবে আমার চিঠি, গ্রাহক মাশুল দিয়ে নেবে। একি, একি—খাম ছিঁড়ে পড়তে লেগেছেন যে! টের পেলেন কি করে যে গ্রাহক আপনিই! ডাকবাক্স ঠিকানা পড়ে না—তবে আর ডাকবাক্স কেমন করে আপনি! তার কিছু উপরে—

কি হলে কাঞ্চন চিরকাল থেকে যাবে, সেই প্রশ্নের জবাব। সে দিন যেকথা নিরঞ্জনকে মুখে বলতে পারেনি, সোজাসুজি লিখে জানিয়েছে তাই। মেয়ে হয়ে পুরুষকে লিখেছে। গভীর মনোযোগে নিরঞ্জন চিঠির কথাগুলো পড়ছে—ঢিবঢিব করে তখন কাঞ্চনের বুকের ভিতরটা। চুপ করে থাকলে বুকের শব্দ বুঝি বাইরের লোকের কানে যাবে—অসংলগ্ন অর্থহীন নানান রকম বকে যাচ্ছে তাই।

পড়া শেষ করে নিরঞ্জন চোখ তুলল কাঞ্চনের দিকে। অস্থির ভাবে কাঞ্চন পায়চারি করছে, আর বকছে অবিরাম। কিন্তু চোখ থাকলে নিরঞ্জন তুমি দেখতে পেতে এক নিঃশব্দ কাতর প্রার্থিনী অঞ্জলি জুড়ে সামনে দাঁড়িয়ে। বেণধরের আদরের ছোট বোন, তোমার শৈল-জেঠার সর্বশেষ মেয়ে, টমাস-রাইটনের ম্যানেজার জগন্নাথ চৌধুরীর ভাগনী। মেয়েটার ভাল ঘর-বরের জন্য শৈলধর তোমার কাছেই কতবার বলেছেন, বেণু সেই কলকাতার মেসে কত উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল—

নিরঞ্জন বলে, উপায় নেই যে কাঞ্চন। ললিতার সঙ্গে বিয়ে আমার—সুজনপুরের মেয়ে ললিতা দুধসরের বউ হয়ে আসছে। পাকা-কথা দিয়েছি, ও-পক্ষও রাজী! একটা চোখ কানা, নিজেই তা জাহির করে দিল। অঞ্চল শুদ্ধ জেনে গেছে। কতজনের খোশামুদি করলাম, ও-মেয়ে কেউ বিয়ে করতে যাবে না।

নিশ্বাস ফেলে বলে, অথচ দুটো মাস আগেও এই ললিতার জন্য দীনেশ পাগল। অসুখে চোখ গেল, আর সকল সম্বন্ধ ধুয়ে মুছে গেল সঙ্গে সঙ্গে। তা ভেবে দেখতে গেলে ভালই হয়েছে। বাপ-মায়ের অমতে জেদ করে দীনেশ বিয়ে করছিল—বউকে তাঁরা কক্ষনো সুনজরে দেখতেন না। এর উপরে জানতে পেলেন, বউয়ের একটা চোখ নেই—তখন আর কোনো রকমেই রেহাই ছিল না, ঝাঁটা মার, ঝাঁটা মার করে বাড়ি থেকে তাড়াতেন।

এমনি বলে যাচ্ছিল একনাগাড়। কাঞ্চন খিলখিল করে হেসে উঠল। চমক খেয়ে নিরঞ্জন চুপ করে যায়।

কাঞ্চন বলে, সমস্ত আমার জানা, আপনার একটা খবরও নতুন নয় নিরঞ্জনদা। জানি বলেই তো এমন চিঠি লিখেছি। নইলে যত বড় বেহায়াই হই, মেয়েছেলে হয়ে কেউ পারে না এমন! চিঠির ধাপ্পায় আপনার মুখ দিয়েই আগাগোড়া শুনে নিলাম।

নিরঞ্জন সবিস্ময়ে বলে, কথাবার্তা কালই মাত্র পাকা হয়ে গেল। বাইরের কেউ জানে না—তোমার কানে গেল কি করে?

গণে বলতে পারি আমি, মন পড়তে জানি। কিন্তু আপনার ব্যাপারে এত সব লাগে না। সুজনপুরের সঙ্গে আড়াআড়ি—অথচ দিন নেই রাত নেই সেখানে আসা-যাওয়া চলছে, পিওনমশায়ের বাড়ি আস্তানা—মতলব এর পরে যে না সে-ই ধরতে পারে।

একটু থেমে আবার বলে, দিব্যি হয়েছে, বড্ড খুশী আমি। কানা-খোঁড়া না হলে কে-ই বা মেয়ে দেবে! দুটো চোখ যদ্দিন বজায় ছিল, তখন আপনার কথা ওঠেনি।

তিক্ত কথার নিতান্তই বাজে খরচ। নিরঞ্জনের তিলমাত্র ভাবান্তর নেই। মাথা নেড়ে সপ্রতিভ কণ্ঠে বলে, তেমন হলে আমিও কি ঘাড় পেতে দায় নিতে যেতাম? তুমি কত সুন্দর, অসুখটা হবার আগেও ললিতা তোমার পায়ের কাছে দাঁড়াতে পারত না—সেই তোমারই সঙ্গে সম্বন্ধ উঠেছিল। বেণুধর ধরাপাড়া করেছিল, আমি কবুল-

জবাব দিয়ে দিলাম। এখন ভাবছি, রাজী হলেই ভাল ছিল তখন। যত-কিছু হাঙ্গামা তোমার জন্যেই তো—

আমি কি করলাম ?

পালাই-পালাই রব তুলেছ। এত কষ্টের ইস্কুল উঠে যাবার দাখিল। তবু একটা হাতের-পাঁচ রইল। ঘরের বউ হয়ে ললিতা আর পালাতে পারবে না। তোমার অবর্তমানে যা-হোক করে চালিয়ে যাবে। একটা চোখ ভাল আছে, একচোখ নিয়ে পড়ানোর অসুবিধা নেই। বলো, এ ছাড়া আর কি করা যেত ?

কাঞ্চন সায় দিয়ে বলে, ভালই করেছেন।

নিরঞ্জন বলে যাচ্ছে, উল্টো দিকটাও ভেবেছি। ধরো, বিয়ে করলাম না ললিতাকে। কানা মেয়ের বিয়েই হল না, সুজনপুরে বাপের বাড়ি পড়ে রইল। বইটই আনিয়ে বাড়ি বসে এরই মধ্যে পড়াশুনো শুরু করেছে—পর পর পাশও করে যাবে ঠিক। পাশ-করা পুরোদস্তুর শিক্ষিত মেয়ে গাঁয়ের উপর—তখন কি আর সুজনপুর ছাড়বে ইস্কুল না বানিয়ে ? সেই ভয়ে আরও তাড়াতাড়ি সরিয়ে আনছি।

কাঞ্চন নিশ্বাস ফেলে বলল, নির্ভাবনা হলাম, দায়িত্ব চুকল। চলে যেতে আর কোন বাধা নেই।

নিরঞ্জন গভীর দৃষ্টিতে কাঞ্চনের দিকে তাকাল। মৃদু হাসি ফুটল তার মুখে। বলে, তোমার ভয় দেখানো কথা। যাবে না তুমি কাঞ্চন, যেতে পারো না—সে আমি জানি। হাতে-গড়া এমন জিনিস কেউ বিসর্জন দিয়ে যেতে পারে ? এ যে সন্তানের মতো। তুমি রয়েছ, ললিতাকেও নিয়ে আসছি। ইস্কুল মস্তবড় হয়ে যাচ্ছে—একলা একজনে কত আর সামলাবে ? তুমি হেডমিস্ট্রেস আছ, তোমার নিচে এসিস্টাণ্ট-মিস্ট্রেস ললিতা—

বলতে বলতে নিরঞ্জন উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেঃ কলকাতার মতলব ছেড়ে দাও। বেণুর বড় আদরের বোন তুমি, সেই জোরে নিয়ে বলছি। গ্রামের মধ্যেই সুপাত্র—বিজয়রা বড়লোক, অগাধ

বিষয়সম্পত্তি। শৈল-জেঠার ইচ্ছে আছে। আর বেণুও মত দিয়েছিল, তুমি একদিন বলছিলে। খাসা থাকবে কাঞ্চন, গ্রামের মেয়ে আছ, তার উপরে গ্রামের বউ হয়ে চিরকাল দুধসরে থেকে যাবে। তোমার শ্বশুরের নামের বালিকা-বিদ্যালয় -দিনকে-দিন জেঁকে উঠে হাই-ইস্কুলে দাঁড়াবে। তল্লাটের মধ্যে প্রথম হাই-ইস্কুল মেয়েদের জন্য। দুধসরের জয়-জয়কার!

কিন্তু বলছে কাকে? হিত পরামর্শ কাঞ্চনের কানে ঢোকে না। দাওয়া থেকে নেমে উঠান পার হয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। এ মেয়ের মনের তল পাওয়া দুষ্কর।

পুরঞ্জয় বালিকা-বিদ্যালয়ে গ্রীষ্মের ছুটি হয়ে যাচ্ছে—ঠিক সেই দিন, কোথাও কিছু নেই—কলকাতা থেকে স্বয়ং জগন্নাথ চৌধুরী এসে হাজির। শুকনোর সময় জীপগাড়িটা এখন কষ্টেসৃষ্টে চলে। সদরের এক কন্ট্রাক্টরের কোনো কোনো সূত্রে ব্রাইটন কোম্পানির সঙ্গে বাধ্য-বাধকতা—তাদের একটা জীপ চেয়ে এনেছেন, এবং তাদেরই দুটো নেপালি গার্ড সঙ্গে। কখনো কাঁচা রাস্তায় কখনো বা মাঠের উপর দিয়ে গর্জন তুলে শৈলধরের বাড়ির সামনে টলতে টলতে জীপ এসে থামল।

গাড়ির আওয়াজে ইতর-ভদ্র অনেকে ভিড় করেছে। নেমে পড়ে জগন্নাথের প্রথম কথা: নিজে চলে এলাম। কারা আটকাতে আসে, দেখি।

গ্রামের মতিগতির সমস্ত খবর জানেন তিনি। শৈলধরই যে সংবাদদাতা তাতে কোন সন্দেহ নেই।

যাত্রামুখে হন্তদন্ত হয়ে নিরঞ্জন এসে পড়ল। এক পাল মেয়ে সঙ্গে। কাঞ্চনকে বলে, চললে সত্যিই? দুধসরের নাম নিয়ে কিছু আর বলছিনে—কিন্তু তোমার ছাত্রীরা এসেছে, এদের কাছে জবাব দিয়ে যাও।

কাঞ্চন বলে, আপনিই জুটিয়ে আনলেন এদের।

ঠিক উল্টো, জিজ্ঞাসা করে দেখ। মুরুব্বি ধরে আমাকেই টানতে টানতে নিয়ে এসেছে। এনে খারাপ করল। এমনি যদিই বা কিছু আশা ছিল, আমায় দেখে বিগড়ে গেলে। আমার উপরে রাগ তোমার।

কণ্ঠে বেদনার আভাস। আজ এই সর্বপ্রথম কাঞ্চন অনুভব করল, পাথরের মানুষটার ভিতরেও মন বলে কিছু বস্তু আছে। মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে নিরঞ্জন বলে, আমার উপর তোমার ভীষণ রাগ। গোড়া থেকেই। প্রথম আসার পর এই উঠোনেই একদিন কী ঝগড়াটা করলে! তোমার হয়তো মনে নেই কাঞ্চন, আমি ভুলতে পারিনি।

শৈলধর কোনদিকে ছিলেন, গজর-গজর করে এসে পড়লেন। জগন্নাথকে সাক্ষি মানেন: শয়তানিটা দেখো ভায়া। বন্দুকের মুখে নিজেদের দাঁড়ানোর মুরোদ নেই, গুচ্ছের প্রমীলা-সৈন্য লেলিয়ে দিয়েছে। একে শিশু তায় স্ত্রীজাতি—সাত-খুন মাপ এদের।

কাঞ্চন কঠিন হয়ে প্রতিবাদ করে: না বাবা, আমার মেয়েদের নিয়ে একটা কথাও তুমি বলতে পারবে না। নাড়িনক্ষত্র জানি ওদের —কেউ লেলিয়ে দেয়নি। আমায় ভালবাসে, মনের টানে চলে এসেছে। চোখের দেখা দেখে যাবে, তাতেও কেন তোমাদের আপত্তি?

কলকাতা থেকে জগন্নাথ কিছু কেক-প্যাট্রিস এনেছেন, ভাগ করে কাঞ্চন মেয়েদের হাতে হাতে দিল। কাজল মেয়েটা নেবে না কিছুতে। অভিমানরুদ্ধ কণ্ঠে বলে, খাবো না তো—কক্ষনো নয়। চলে যাচ্ছ দিদিমণি আমাদের ছেড়ে—আর নাকি আসবে না?

কথা কেড়ে নিয়ে হেসে হেসে কাঞ্চন প্রবোধ দেয়: কী বোকা মেয়ে রে! মিছামিছি কে তোদের ভয় দেখিয়েছে। আসব রে, আসব। তোদের ছেড়ে থাকা যায় না কি?

কাজল বলে, খাতায় লিখে দাও তুমি আসবে। কোনখানে থাকবে, ঠিকানা দাও—আমরা চিঠি লিখব।

মেয়েটার মুখে মৃদু টোকা দিয়ে কলকণ্ঠে কাঞ্চন বলে ওঠে, দেখ মামা, কী সাংঘাতিক। দলিল বানিয়ে আটেঘাটে বেঁধে নিচ্ছে। নয়তো ছেড়ে দেবে না।

অবশেষে জীপে উঠে পড়ল কাঞ্চন। সামনের সিটে, জগন্নাথের পাশটিতে।

তাকিয়ে দেখে জগন্নাথ বলেন, এই সাজে কেন মা?

কাঞ্চন বলে, কলকাতা থেকে অনেক সেজে এসেছিলাম মামা। সে কি আর এদ্দিন থাকে, ছিঁড়েছুটে কবে শেষ হয়ে গেছে। এখন এই।

জগন্নাথ বলেন, দু'টো-একটা জিনিস আমিও তো হাতে করে এসেছি। কাপড়টা বদলে অন্তত একটা রংচঙে ভাল কাপড় পরে আয়।

কাঞ্চন ঘাড় নাড়েঃ কী যে বলো মামা! আমার মেয়েরা সব রয়েছে—লজ্জা করে ওদের সামনে রঙিন কাপড় পরতে।

নিশ্বাস ফেলে বিষণ্ণ কণ্ঠে আবার বলে, শখের কাপড় পরবার বয়স ওদেরই—পাবে কোথা? সাদামাটা একখানা আস্ত কাপড়ই বা কজনের আছে! যা পরে আছি, মন্দটা কি দেখছ মামা? সবাই এখানে এমনি জিনিস পরে।

জগন্নাথ কিছু বিরক্ত হয়ে বলেন, গাঁয়ে পড়ে পড়ে মাস্টারি করে আদ্যিকালের বুড়ি হয়ে গেছিস তুই। রুচি জাহান্নমে গেছে। কলকাতায় কত আনন্দ করে বেড়াতিস—চল্, আবার দেখা যাবে সেখানে।

গাড়ি চলছে। মেয়েরা দাঁড়িয়ে আছে—আরও একজন, নিরঞ্জন তাদের পাশে। একদৃষ্টে কাঞ্চন সেদিকে তাকিয়ে ছিল, জগন্নাথের কথায় চকিতে ঘাড় ফেরাল। বলে, আনন্দ এখানে নেই? তোমরা ভাবো, আনন্দ কেবল টাকায় কাপড়-চোপড়ে ক্লাবে হোটেলে। চেয়ে দেখ, কত আনন্দ ঐ পিছনে ফেলে চললাম।

॥ ষোল ॥

কলকাতায় জগন্নাথ চৌধুরীর নতুন বাসায়। যেহেতু ভাড়া বাড়ি, বাসাই বলতে হবে আপাতত। যতদিন না জগন্নাথ আবার নিজস্ব বাড়ি বানিয়ে নিচ্ছেন। বেশ কিছু দেরি হবে—আর হলেও এমন অভিজাত-পাড়ার মধ্যে এত সুন্দর বাড়ি হবে বলে ভরসা নেই।

গাড়ি থেকে নেমে কাঞ্চন ধুলো-পায়েই একবার উপর-নিচে চক্কোর দিয়ে এলো। নতুন সব ঝি-চাকর—পুরনোর মধ্যে একটি ছুটি। জ্যোৎস্না অবাক হয়ে থাকেন: এ কী রে! আমাদের কাঞ্চন বলে চেনার উপায় নেই।

কাঞ্চন বলে, ছিলাম না যে তোমাদের এদ্দিন।

জগন্নাথের কানে গেছে। তিনি বললেন, রোমে গিয়ে রোমান হতে হয়—ওর কী দোষ! আবার এই হাজির করে দিলাম, মেয়ে তোমার অভিরুচি মতো গড়ে পিটে নাও।

মামী কাঞ্চনের আপাদমস্তক বার বার তাকিয়ে দেখে বলেন, মাগো! খালি-পায়ে হাঁটু অবধি ধুলো—এক জোড়া চটি পর্যন্ত জোটেনি।

জগন্নাথ বলেন, তা বললে হবে কেন। পনেরটি টাকার উপর নির্ভর—ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলায় না। বেণু কিছু কিছু পাঠাত, সে পর্ব চুকে-বুকে গেছে। বয়স হয়ে ঘোষজা মশায়ও চরে-ফিরে বেড়াতে পারেন না। ক্ষেতের ধান চাট্টি পাওয়া যায়, তাই উপোস করতে হয়নি। এর উপরে জুতো আসে কেমন করে?

কাঞ্চন হেসে বলে, না হয় ধারকর্জ করে কিনলাম এক জোড়া জুতো। গাঁয়ের মধ্যে পরি কোথা বলো দিকি। যে জুতো কলকাতা থেকে পরে গিয়েছিলাম, হাঁ-করে সবাই তার দিকে তাকিয়ে থাকত। দৃষ্টির খোঁচা খেয়ে খেয়ে শেষটা একদিন রাগ করে জুতো পানাপুকুরে ছুঁড়ে দিলাম।

জ্যোৎস্নার দিকে চেয়ে বলে, পায়ে জুতো না দেখে অবাক হচ্ছ মামীমা। হবারই কথা। শহরের মেয়ে তুমি, থেকেছও চিরকাল শহরে —খালি-পায়ের মানুষ তোমরা ভাবতে পারো না। কিন্তু গাঁয়ের মধ্যে মেয়েলোকের তো কথাই ওঠে না—পুরুষের পায়ে, এমন কি বাচ্চা ছেলেপুলের পায়ে পর্যন্ত জুতো জোটে না। মামা ঠিক কথা বলেছেন —আমাদের ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলাতো না। কিন্তু টাকাপয়সা থাকলে সকলের আগে আমি বাচ্চাদের জন্য জুতো কিনে দিতাম।

তখন এই পর্যন্ত।

বিকালবেলা জ্যোৎস্না এসে ডাকলেন: আয়রে কাঞ্চন, বেড়িয়ে আসি।

কোথায় মামীমা ?

মার্কেটে। ভস্মমাখা সন্ন্যাসিনী হয়ে ঘুরবি, সে তো আমরা চোখে দেখতে পারিনে। তোর মামা তাই গাড়ি নিয়ে অফিস থেকে সকাল সকাল ফিরলেন।

বড্ড যে তাড়া! আজ এসেছি, একেবারে আজকের দিনের মধ্যেই ? বলেই কাঞ্চন সঙ্গে সঙ্গে কথা ফিরিয়ে নেয়: বুঝেছি মামীমা, মানের হানি হচ্ছে তোমাদের। তা চলো—

অতএব মামীর সঙ্গে মার্কেটে ঘুরে ঘুরে শুধুমাত্র পায়ের জুতো নয়, একগাদা পোশাক-আশাক নিয়ে এলো কাঞ্চন। আর রকমারি প্রসাধনের জিনিস। শহরের মেয়েরা হালফিল যেমন যেমন সাজে— যা এখনকার সর্বাধুনিক ফ্যাসান, যেমন ভাবে বেড়ালে গ্রাইটন কোম্পানির জেনারেল-ম্যানেজারের ভাগনীর পক্ষে বেমানান হবে না। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সমস্ত কেনা হয়েছে।

বাড়ি ফিরে প্যাকেটগুলো নিয়ে কাঞ্চন ঘরের দরজা দিল। সাজ করছে। বেরল ঘণ্টাখানেক পরে।

জ্যোৎস্না অবাক: এ কি পরিসনি যে কিছু ? ঘরে বসে এতক্ষণ ধরে কি করলি তবে ?

পরেছিলাম বই কি। পরে আয়নায় দেখলাম। ভুলে যাইনি, ঠিক আছে মোটামুটি। মুশকিল হল মামীমা, এত সমস্ত গায়ে চড়িয়ে গরম লাগে বড্ড, গায়ে ফোটে। খুলে রেখে এলাম।

জ্যোৎস্না তো হেসে খুন। পুরনো ঝি সুমতিকে ডেকে বলেন, শোন্‌রে মতি, মেয়ের কথা। দু-বছর জঙ্গলে থেকে জংলি হয়ে এসেছে। কাপড়-চোপড় নাকি গায়ে ফোটে—

অধীর কণ্ঠে বলে উঠলেন, এ বেশ চোখ চেয়ে দেখতে পারছিনে—বদলে আয়। বদলে আয় বলছি। না হয় চল্, আমি পরিয়ে দিই গে।

কাঞ্চন সকাতরে বলে, রাত্রে নয় মামীমা, রাতটুকু মাপ করো। যা পরে আছি, তাই থাকুক। অনভ্যাসের জিনিস পরে ঘুম হবে না আমার। বরঞ্চ ঘরের বড় আলোটা নিভিয়ে দিচ্ছি, আধ-অন্ধকারে চোখে তেমন লাগবে না। রাত পোহায়ে দিনমান হোক—যেমন বলবে তখন তেমনি সেজে বেড়াব। তোমাদের মুখ হেট হবে, তেমন কাজ কক্ষনো আমি করব না।

তা কথার ঠিক রাখল বটে। বড়ঘরের মেয়ের উপযুক্ত সাজসজ্জা করল পরের দিন। মামীর কাছে গিয়ে কাঞ্চন টিপিটিপি হাসে: চেয়ে দেখ।

জ্যোৎস্নার চোখে পলক নেই: কী রূপ খুলেছে মরি মরি! ওরে হতচ্ছাড়ী, কাল আয়নায় দেখেছিলি, এখন একটিবার দেখে আয়। এই হয়েছিস—আর কী চেহারায় উঠেছিলি কাল বাড়িতে!

কাঞ্চন ঠোঁট ফুলিয়ে বলে, বড্ড গালি হয়ে যাচ্ছে মামীমা—

গালি—তোকে?

দু-হাতে জ্যোৎস্না তাকে কোলের মধ্যে টেনে নিলেন। ঠিক এমনি করেই আর একদিন ফুটফুটে শিশু-কাঞ্চনকে নিয়েছিলেন—গঙ্গাস্নান উপলক্ষে শৈলধর সপরিবারে তাঁদের বাড়ি যখন এসে উঠলেন।

বলেন, তোকে গালাগালি করব—হায় আমার কপাল! বললি তুই এমন কথাটা!

কাঞ্চন বলে, তোমার কথার মানে গালি হয়ে দাঁড়ায় কিনা দেখ ভেবে। যত-কিছু রূপ তোমাদের পোশাকের গুণেই। আমার নিজস্ব যেটুকু, যা নিয়ে কাল এখানে উঠেছিলাম—চোখ তুলে দেখবার মতো নয় সে জিনিস।

হাসে কাঞ্চন। কথায় কে পারবে তার সঙ্গে—হাসতে হাসতে বলে, দেখ মামীমা, কানাকে কানা খোঁড়াকে খোঁড়া বলতে নেই। কষ্ট হয়। আমি কুরূপ-কুচ্ছিত। সাজসজ্জায় আষ্টেপিষ্টে ঢাকা না দিলে চোখ চাওয়া যায় না, কেন সেটা বার বার মনে করিয়ে দাও?

জগন্নাথ যাচ্ছিলেন, তাঁকে ডাকলেন জ্যোৎস্না: শুনে যাও। আমাদের কাঞ্চন কুরূপ-কুচ্ছিত, সেইজন্যে তাকে নাকি সাজতে-গুজতে বলি।

কাঞ্চন বলে, সাজগোজ নিয়েই কি মানুষ? বলো মামা।

জগন্নাথ বলেন, সাজগোজ বাদ দিয়েও কিন্তু নয়। আদিকাল থেকে মানুষ মাথা খাটিয়ে খাটিয়ে দেহ সাজাবার রকমারি কায়দা-কৌশল বের করেছে। শুধু দেহই বা কেন, যা তার দু-চোখে পড়ে সাজসজ্জায় বাহার করতে চেয়েছে। এ জিনিস তুচ্ছ বলো কি করে মা?

কাঞ্চন তর্ক ছাড়ে না: যে মানুষগুলোর প্রাণে সাড় নেই, দেহ সাজিয়ে আরও কিন্তু বিশ্রী দেখায় মামা। আমি যেমন ছিলাম তোমাদের বাড়ি। মমি যেন কবরের বাক্স থেকে উঠে রংচঙে সাজ পোশাক করে ঘুরে বেড়িয়েছি।

মঞ্জুলাকে কাঞ্চন স্থধসর থেকেই চিঠি দিয়েছিল। দেখা করতে এলে কাঞ্চন তাকে ধরেও গালি পাড়ছে।

সাজগোজ-করা পুতুল তোরা এক একটি। মেয়েদের কথাই বলি বিশেষ করে—তোর আমার মতন যেসব মেয়ে। আর যারা আমাদের মেয়েও উঁচু রাজ্যে বিচরণ করে। মামা-মামী ছাড়েন না, এখানে এসে

আবার আমার সেই পুরনো দশা হয়েছে। লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে ভাই।

কাঞ্চনের মুখে এই সব কথা—ছনিয়ায় আশ্চর্যতর তবে আর কি রইল ? মঞ্জুলা অবাক হয়ে বলে : আগে এসব বলতিসনে কাঞ্চন। আগে কোনোদিন লজ্জা করেনি। আমাদের এখনো করে না। গাঁ থেকে চোখ বদলে এসেছিস তুই।

ঘাড় নেড়ে কাঞ্চন সগর্বে স্বীকার করে নেয় : গাঁয়ে থেকে মুখোমুখি জীবন দেখে এলাম। এখানে জীবন কোথা তোদের মাঝে—অভিনয়ই শুধু।

ত্বধসরের সেই গোড়ার চিঠির কথা তুলে মঞ্জুলা খোঁটা দিল : কী নিন্দেটা করেছিলি—মনে পড়ে ? গাঁয়ের মানুষরা কূপমণ্ডুক, নিজের গ্রাম আর পাশের গ্রাম নিয়ে পাল্লাপাল্লি—

কাঞ্চন বলে, সে তবু অনেক ভাল মঞ্জুলা। এরা কি—যত-কিছু এদের, শুধুমাত্র নিজেকে নিয়ে। নিজের সুখশান্তি, নিজের ভোগ-ঐশ্বর্য। অতিবড় মহৎ যিনি, নিজের উপরে তিনি বড় জোর নিজ সংসারটি নিয়ে আছেন। বহুজনকে আপন মেনে বৃহৎ পরিধির জীবন থাকে, বিপুল তার পরিতৃপ্তি—এ সব চেতনা শিক্ষিত মহল থেকে হঠাৎ যেন হারিয়ে গেল। কোনোখানে তার প্রকাশ দেখিনে—

একটু থেমে দম নিয়ে আবার বলছে, বোধ করি স্বাধীনতারই বিষফল। লড়াইয়ের ব্যাপার নেই, তাই ক্ষুদিরাম-গোপীনাথের মতো প্রীতিলতা-উজ্জ্বলার মতো তরুণ ছেলেমেয়ে এগিয়ে আসে না। সুযোগ-সমৃদ্ধির নানান দরজা খোলা—প্রতিভাধারীদের কতক গেল রাজ-সরকারে, কতক কালোবাজারে, কতক বা—

আরো কি বলত কাঞ্চন—শেষ করতে না দিয়ে মঞ্জুলা কথার মধ্যে গুঁজে দেয় : লড়াই নেই, কে বলে ? ভারি ভারি লড়নেওয়ালা—ক্ষুধাতুরগোষ্ঠী, রাগী-তরুণ—আরো কত নামের দল। কলম কালি আর কণ্ঠধ্বনির লড়াই।

হাসতে হাসতে বলে, গাঁয়ে পড়ে ছিলি, হালের খবর ক'টাই বা রাখিস—

মুখে ইঙ্গিতভঙ্গি এবং হা-হুতাশ যতই করুক, মামাবাড়ির সেই আগেকার কাঞ্চনই সে আপাতত।

জগন্নাথ বলেন, গোলমালের মধ্যে পড়াটা তোর বন্ধ হয়ে গেল। সে চলবে না মা, নতুন সেসানে বি.এ. ক্লাসে ভর্তি হয়ে পড়—

কাঞ্চন বলে, কদ্দিন হয়ে গেল, সে কি আর কিছু মনে আছে মা? যা ভিড় আজকাল কলেজে, ভর্তিও তো হতে পারব না।

সে ভার আমার উপরে। তোর কিছু করতে হবে না, তুই চুপ করে বসে থাক। পড়াশুনো আমার চলবে, এইটে জেনে রেখে দে।

হেসে জগন্নাথ বলেন, মাঝের এই দুটো বছরে হলে কোন-কিছুই হত না, বন্ধুরা চিনতেই পারত না আমায়। চাকরিতে ফিরেছি, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ফিরেছে। যার সঙ্গে যে খাতির, আবার অটুট হয়েছে সমস্ত। ভর্তি তুই এক কথায় হয়ে যাবি।

ফাঁকে ফাঁকে কাঞ্চন তুধসরের কথা শোনায়, বালিকা-বিদ্যালয়ের কথা: গ্রীষ্মের বন্ধ কমিয়ে দিয়ে এসেছি মামা। শীতের বন্ধ হয়েছিল কিনা।

হেসে হেসে বলে, শীতের বন্ধের কথা শুনেছ মামা কস্মিনকালে? আমাদের তাই দিতে হল। আমারই দোষে। সেই যে মঞ্জুলার বিয়েয় এসেছিলাম, বস্তিতে গেলাম তোমাদের কাছে—তার খেসারত। গ্রীষ্মের বন্ধ ছাঁটতে হয়েছে—মোটে আর পঁচিশটে দিন।

জগন্নাথ বিরক্ত কণ্ঠে বলেন, পঁচিশ দিন থাকুক আর পাঁচশ দিন থাকুক, তোর সেজন্য কি? আর যখন যাচ্ছিসনে—

সে হয় না মামা। চাকরি ছেড়ে দিয়ে তো আসিনি, ছুটিতে এসেছি। না গেলে তারাই ছাড়িয়ে দেবে।

তবে আর শুনছ কি এতদিন ধরে! দায়িত্ব সমস্ত আমার উপরে। আমি হেডমিস্ট্রেস—আরো যত মিস্ট্রেস থাকা উচিত, সমস্ত

আমি একাধারে। কুসুম বলে ঝি আছে একটা—কোন দিন না এলে ঝি-ও আমি সেদিনের জন্য। একবার যেতেই হবে মামা। গিয়ে চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে মাইনের টাকা হিসেব করে নিয়ে আসব।

জগন্নাথ ব্যঙ্গস্বরে বলেন, সে তো অঢেল টাকা—

তা কম হল কিসে? পনের টাকায় ঢুকেছিলাম, কাজ দেখে কমিটি বিশ টাকায় তুলেছে। আরও উঠবে, আশা দিয়েছে। ইস্কুল খোলার দিন কাজে যোগ দিলে চব্বিশ দিনের মাইনে পাওনা হবে আমার। দেখ তাহলে হিসাব করে—

নিতান্ত নিরীহভাবে কাঞ্চন বলে যায়, জগন্নাথ চৌধুরী রেগে টং। বলেন, হিসাবটা তুই করগে যা। আমার কানে তুলবি নে, কান জ্বালা করে।

মামা কলেজে ভর্তির ব্যবস্থায় আছেন, আর মামী আছেন ওদিকে বিয়ে গাঁথবার তালে। ঘটকের চলাচল ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে, কাঞ্চন টের পাচ্ছে সমস্ত। অর্থাৎ দু-বছর আগে যেখানটা ছেদ পড়েছিল, ঠিক ঠিক সেইখান থেকে আরম্ভ। এই দুটো বছর মামা-মামী মুছে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চান কাঞ্চনের জীবন থেকে। চাকরির ধারাবাহিকতা ভাঙতে দেননি মামা—ব্রাইটন কোম্পানি গোলমালের এই দুটো বছর চাকরির মধ্যেই ধরে দিয়েছে। অন্যসব ক্ষেত্রেও ঠিক সেই জিনিস।

কানে এলো, সেই আগেকার মতোই জ্যোৎস্না ঘটককে ফরমাশ করছেন, মিষ্টি-স্বভাব ভাল বংশের শিক্ষিত ছেলে, দেখতেও খুব সুন্দর হবে। অবস্থা তেমন ভাল না হলেও ক্ষতি নেই। টাকা-ওয়ালাদের বড্ড দেমাক, মেয়ের যত্ন হবে না তেমন। অবস্থা নরম দেখেই আপনি খোঁজ করবেন ঘটকমশায়। বাড়িতে ছেলে নেই -যাকে ছেলের মতন পালন করেছিলাম, সে ফাঁকি দিয়ে চলে গেল। জামাই আমার এমন চাই, ছেলের মতন মা-মা করে সদাসর্বদা চোখের সামনে ঘুরবে।

বর্ণনাটা সমরের সম্পর্কেই হুবহু খাটে। কথাগুলো কোন রকমে কানে পৌঁছে থাকবে, একদিন সকালবেলা সে সশরীরে হাজির।

কাঞ্চন বিগলিত কণ্ঠে আহবান করে: আসুন, আসুন—রোজই ভাবি আপনার কথা।

অভিমান ভরে সমর বলে, জানব কি করে যে কলকাতায় এসেছ? একটা যদি খবর পাঠিয়ে দিতে—

কাঞ্চন বলে, সাহস হয়নি। ভেবেছিলাম এতদিনে আপনি আরও বিস্তর উঁচুতে। আমাদের ছুঁয়ে ফেলে অনেক—অনেক উঁচুতে উড়ছেন। খবর দিলে আসবেন না—সাধ করে কেন অপমান কুড়োতে যাই।

সমর বলে, দেখছ তো খবরটা নিজে কুড়িয়েই ছুটে এসেছি—

অবাক লাগছে সত্যি। করিতকর্মা তুখড় মানুষ—আপনার ক্ষমতার উপর অগাধ বিশ্বাস ছিল। হল কি বলুন দিকি? ছ-ছটো বছর কেটে গেল, অথচ একই ধাপে পড়ে আছেন আপনি। সেই জেনারেল-ম্যানেজারের বাড়ি—ঘুরে ফিরে ম্যানেজারের সেই ভাগনী। উঠতে পারলেন আর কই?

কথা কেমন গোলমেলে লাগে সমরের কাছে।

কাঞ্চন বলে যাচ্ছে, আপনার ক্রমোন্নতির ইতিহাসটা ভাবি। নানান ঘাটের জল খেয়ে টমাস ব্রাইটন কোম্পানিতে ভিড়লেন। পদস্থাপনা হল কাশিয়ার শ্যামকান্ত মিস্তিরের ভাইঝি মঞ্জুলা মিত্তিরের মাথায়। সেখান থেকে আর এক ধাপ উঠে ধন্য করলেন ম্যানেজারের ভাগনী এই অধমাকে। ম্যানেজারের বিপর্যয় ঘটল তো সেখানে এলো নতুন ম্যানেজারের মেয়ে অর্পিতা। কিন্তু ম্যানেজারেই থেমে রইলেন—এদ্দিনে তো কোম্পানির খোদ ডিরেক্টরের বাড়ি অবধি পৌছনোর কথা। ও, ডিরেক্টরের মেয়ে-ভাগনী নেই বুঝি তেমন? ধরেছি ঠিক—

চুকচুক করে আপসোস জানিয়ে কাঞ্চন বলে, তাই হবে। চা বসুন, চা নিয়ে আসি—

খিলখিল করে হেসে ওঠে কাঞ্চন : মেয়ে আমার একটি-দুটি নয়—অনেক। পঞ্চাশের কাছাকাছি। তারা ঘিরে ধরেছিল আসবার সময়। মনে তাদের সন্দেহ উঠেছিল : দিদিমণি, তুমি কিন্তু ফিরে যাও ফিরে আসবে। আসব বলে কথা দিয়ে এসেছি। মিথ্যা হলে অন্য সকলের কাছে, তাদের কাছে মিথ্যেবাদী হতে পারব না। প্রথম ক'দিন বুঝতে পারিনি, যত দিন যাচ্ছে পাগল হয়ে উঠছি।

এবারে তবে মঞ্জুলার কথা বলে, মেয়ে শুধু নয়, আরও আছে সেই মানুষটি—

মানুষ নয়, পোস্টমাস্টার। না, তারও নিচে চাকরা। [illegible] মঞ্জুলা, আমার বড় ইচ্ছে করে ছুরি চালিয়ে [illegible] [illegible] দেখতে। সেখানে রক্তমাংস মেদমজ্জা মুস্ফুস হৃৎপিণ্ড নরম জিনিস কিছু নেই। খটখটে শুকনো হাড়ের বোঝা।

বলতে বলতে কণ্ঠ সজল হয়ে ওঠে বুঝি। বলে, শক্ত [illegible] [illegible]। চাকরি করে নতুন মাস্টার আনছে। সেই আমার [illegible] মিস্ট্রেস আনিয়েছেন আমার নিচে। দু বছর গায়ের রক্ত জল করে ইস্কুল গড়েছি।

আসবার দিনে যেমন, যাবার সময়েও সেই সাদা-শাড়ি পরেছে আর [illegible] সেই টিনের সুটকেস।

জ্যোৎস্না বললেন, জিনিসগুলো তোর নাম করে কিনেছি, তা-ও নিয়ে যাবিনে?

নিয়ে কি হবে মামীমা, পরব কোথা?

প্রণাম করে মামা-মামীর পায়ের ধুলো নিল। বলে, অনভ্যাস—পরতে পারিনে, গা কুটকুট করে। পরলেও তো জ্বালা, গাঁসুদ্ধ ফ্যালফ্যাল করে তাকাবে।